বার্লিন বার্ষিকী

শারদীয়া ১৪৩৩



Our Sponsors

HORBACH

hoichoi

ZORA
SUPERMARKT

91.9 friends fm

প্রচ্ছদ ডিজাইনার:

তানিয়া ব্যানার্জী

রূপায়ণে:

দীপাঞ্জন দাস

সম্পাদকমণ্ডলী:

দীপাঞ্জন দাস

সৈকত দত্ত

দেবাদিত্য পান্ডা

পারিজাত মুখার্জী

সূচীপত্র

সভাপতির কলমে	মল্লিক দাস	২
শুধুমাত্র পূজাবার্ষিকীর জন্য	দীপাঞ্জন দাস	৫

এক মণ গল্প

ভুল স্বপ্ন	মৈত্রেয় দত্ত	৭
শেষ মিটিং	দেবাঞ্জন দে	১৪
গুণী চোর	আকাশ দত্ত	১৭
The Fly and the Sun	Akansha Choudhury	২১
Pandal: A Home Away from Home	Areehah Saha	২৩

অর্ধেক হৃদয়

দেবীপক্ষ	বৈভব রোম	২৫
চাঁদ ও শিশুমৃত্যু সংক্রান্ত	শ্রমণ চট্টোপাধ্যায়	২৬
মভ্যতার ভার	দেবাদিত্য পান্ডা	২৮
এ কোন্ সংস্কৃতি ?	উত্তম দত্ত	৩১
শারদ আবেশ	উত্তরা শতরূপ প্রাচী	৩৩
পান্না–বদল	রঞ্জনা দাশ	৩৫
Him	Rwitabrata Chatterjee	৩৭

অজ্ঞাত শরবত

বাহারি চিংড়ি	অমৃতা সাহা	৩৯
Everything that fits	Diya Deb	৪০
বড় দীর্ঘ যখন পথ	কথাকলি ভট্টাচার্য্য	৪৭
ফুটনোট	ইন্দ্রিকা কুন্ডু	৪৯
ঘরে ফেরার গান	অনুপ্রিয়া চক্রবর্তী	৫১

চিরকুটে চিরকুটে কার্টুনিজম

পুটিভুক্ত	পারিজাত মুখার্জী	৫৩

অবাক ভিউ–ফাইন্ডার

Stephan Leiser	৬৭
Arijit Patra	৬৮
Aniboroto Sarkar	৬৯
Dia Deb	৭০
Taniya Banerjee	৭১
Dipanjan Das	৭২

রঙে ভেজা ক্যানভাস

Anupriya Chakraborty	৭৪
Taniya Banerjee	৭৫
Shreya Roy	৭৬
Poulami Ghosh	৭৭
Saikat Dutta	৭৮
Sridatri Bhattacharya	৭৯
Pooja Sur Saha	৮০
Paramita Chakraborty	৮১
Ranjana Das	৮২
Diya Bhattacharya	৮৩

ভোর হলো, দোর খোলো, খুকুমণি ওঠো রে

Urjita Mukherjee, Ajooni Khullar	৮৬
Tveesha Mangal, Aarjoee Saha, Siddiksha Bhattachryya	৮৭
Kiana Panda, Mayra Barik	৮৮

সভাপতির কলমে

এ পুজো আমার, আপনার, আমাদের সকলের

সকল বার্লিনবাসীকে জানাই শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

সময় এসে গেছে মা দুর্গার আগমনের। আবার বার্লিনের বাঙালিরা একত্রিত হবে। শুরু হবে পরিকল্পনা, তারপর প্রস্তুতি। কেউ তৈরি করবে পুজোর থিমড়া, কেউ আঁকবে ছবি, কেউ লিখবে নতুন গান, নতুন কবিতা, আবার কেউ তৈরি করবে নতুন নতুন খাবারের তালিকা। চলবে আলোচনা, ভাবনাচিন্তা, আড্ডা আর কত রকমের পরিকল্পনা!

ধীরে ধীরে একটা একটা করে সপ্তাহ পেরোবে। আর সেই সঙ্গে এক একটা ইট গেঁথে তৈরি হবে মা দুর্গাকে ঘিরে আমাদের আনন্দের পাঁচটা দিন।

এই পাঁচটা দিনকে ঘিরে কত মানুষের কত রকমের ভাবনা, কত স্বপ্ন, কত ছোট ছোট ইচ্ছে! তারপর একসময় সেই সব ভাবনা, সেই সব স্বপ্ন এক সুতোয় গাঁথা হবে। বার্লিনের বাঙালিরা এক ছাদের তলায়, একসঙ্গে, এক পরিবারের মতো মিলিত হবে আমাদের সবচেয়ে প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজো উদ্‌যাপন করতে।

এই তো আমাদের গল্প। ইগনাইটের গল্প। বার্লিনের বাঙালিদের গল্প। খুব সাদামাটা, অথচ ভীষণ প্রাণের, ভীষণ নিজের একটা গল্প।

সারা বছর আমরা সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত থাকি। বাড়ি থেকে প্রায় সাত হাজার কিলোমিটার দূরে আমাদের এই প্রবাসজীবন। কাছে নেই পরিবারের মানুষজন, নেই ছোটবেলার বন্ধু, নেই সেই চেনা পাড়ার আড্ডা। অফিসে সারাক্ষণ ইংরেজি, জার্মান ভাষায় কথা বলতে বলতে কখনও কখনও মনে প্রশ্ন জাগে—আমাদের বাংলা ভাষাটা, আমাদের বাঙালিয়ানাটা কি একদিন হারিয়ে যাবে?

অনেকের মনেই হয়তো প্রশ্ন জাগে, এর সমাধান তো খুব সহজ! কলকাতায় ফিরে গেলেই তো হয়!

কথাটা সত্যি। কিন্তু বাস্তবটা কি এতটাই সহজ? কাজ, সংসার, দায়িত্ব, জীবনের নানা টানাপোড়েন—সবকিছু ছেড়ে প্রতি বছর কি আর ঘরে ফেরা সম্ভব?

তাহলে আমরা যারা ফিরতে পারি না, সেই প্রবাসী বাঙালিরা কী করব? পুজোর দিনগুলোতে ঘরে বসে রিল দেখব, কলকাতার পুজোর ছবি দেখব আর মনখারাপ নিয়ে দিন কাটাব?

না, এমনটা আমরা হতে দিতে পারি না।

আমরা ব্যস্ত হতে পারি, হতে পারি যাযাবর। পৃথিবীকে দেখার তাগিদে, নতুন কিছু করার স্বপ্নে আমরা হয়তো আজ নিজের দেশ, নিজের শহর, নিজের চেনা মানুষদের থেকে অনেক দূরে। কিন্তু তাই বলে আমাদের শিকড়কে ভুলে যেতে হবে কেন? আমাদের উৎসব, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের একসঙ্গে থাকার আনন্দই বা হারিয়ে যাবে কেন?

আমরা যখন একসঙ্গে থাকি, তখন আর একা থাকি না।

আমরা নিজের হাতে মায়ের পুজোর আয়োজন করব, একসঙ্গে গান গাইব, ধুনুচি হাতে নাচব, আড্ডা দেব, লুচি খাব। আর এই সবকিছুর মধ্যে দিয়ে নিজেদের জন্য তৈরি করব এক টুকরো বাংলা, এই বার্লিনের বুকেই।

এই ভাবনা থেকেই বছর ছয়েক আগে কয়েকজন বাঙালি শুরু করেছিলেন বার্লিনের বুকে আমাদের এই দুর্গাপুজোর পথচলা। তখন হয়তো ভাবনাটা ছিল কয়েকটা দিনের জন্য সবাই মিলে পুজো করব, আনন্দ করব, একটু বাড়ির স্বাদ ফিরে পাব।

কিন্তু পুজোর আয়োজন করতে গিয়ে কখন যে দুটো মাস একসঙ্গে কাটিয়ে ফেলি, তা আর খেয়াল থাকে না। চলে আড্ডা, খাওয়াদাওয়া, আলোচনা, পরিকল্পনা, মতের অমিল, ঝগড়াঝাঁটি, আবার মিলেমিশে কাজ করা। কত নতুন বন্ধুত্ব তৈরি হয়, কত মানুষ কাছের হয়ে ওঠেন, কত অচেনা মানুষ আপনজন হয়ে যান!

তখন বুঝতে পারি, আমাদের কাছে দুর্গোৎসবটা শুধু পাঁচ দিনের নয়, দুটো মাসের। পুজোর এই প্রস্তুতির সময়টুকুও আমাদের কাছে উৎসবেরই অংশ। এই সময়টুকু আমাদের একসঙ্গে থাকার, একে অপরকে জানার, বোঝার, পাশে থাকার সময়। এ যেন প্রবাসের ব্যস্ত জীবনের মাঝে নিজেদের জন্য একটু বেঁচে নেওয়া।

ছয় বছর আগে যে পথচলা শুরু হয়েছিল মাত্র ১০–১৫ জন বাঙালিকে নিয়ে, আজ ইগনাইটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন প্রায় ১৩০ জন বাঙালি। আর আমাদের পুজোর দিনগুলোতে যোগ দেন আরও অসংখ্য মানুষ। এমন মানুষ, যাঁরা বার্লিনকে নিজেদের ঘর মনে করেন, আর এখানকার বাঙালিদের ভাবেন নিজেদের পরিবার।

এই পথচলায় আমরা শুধু একটি পুজো তৈরি করিনি। আমরা তৈরি করেছি সম্পর্ক, তৈরি করেছি স্মৃতি, তৈরি করেছি এমন একটি পরিসর, যেখানে দূরদেশে থেকেও মানুষ নিজের শিকড়ের কাছে ফিরে আসতে পারে।

আজ আমাদের এই পুজো ছয় বছরে পা দিচ্ছে। পিছনে ফিরে তাকালে তাই শুধু আনন্দের মুহূর্তগুলো নয়, মনে পড়ে অসংখ্য মানুষের পরিশ্রম, ভালোবাসা আর নিঃস্বার্থ সহযোগিতার কথা। যাঁরা সময় দিয়েছেন, শ্রম দিয়েছেন, পাশে থেকেছেন, কখনও সামনে থেকে, কখনও নেপথ্যে— এই পুজো তাঁদের সকলের।

২০২৬–এর এই দুর্গোৎসবে বার্লিনের সমস্ত বাঙালির কাছে আমার একটাই আবেদন—আসুন, আমরা সবাই মিলে আবার আমাদের এই পুজোকে আমাদের বেঁচে থাকার রসদ করে তুলি। শুধু পুজোর পাঁচটা দিন আনন্দ করার জন্য নয়, বরং সারা বছর মনে রাখার মতো কিছু মুহূর্ত তৈরি করার জন্য।

আসুন, আরও নতুন মানুষকে আপন করে নিই, নতুন বন্ধুত্ব তৈরি করি, একে অপরের পাশে দাঁড়াই। এমন কিছু স্মৃতি তৈরি করি, যেগুলো আঁকড়ে ধরে আমরা আবার অপেক্ষা করব পরের বছরের পুজোর জন্য। অপেক্ষা করব আরও একবার একসঙ্গে হওয়ার, আরও একবার মা দুর্গাকে নিজেদের হাতে বরণ করে নেওয়ার।

সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। মা দুর্গা আমাদের সকলকে শক্তি দিন, আনন্দে রাখুন, ভালো রাখুন।

দেখা হচ্ছে পুজোয়!
এ পুজো আমার, আপনার, আমাদের সকলের পুজো।

শুভ শারদীয়া।
সস্নেহে,
সস্মিত দাস
সভাপতি, Ignite e.V.

শুধুমাত্র পূজাবার্ষিকীর জন্য

দীপাঞ্জন দাস, বার্লিন

Posterity বলেছিল তোমার চোখের কান্না যেদিন কুয়াশা হবে, সেদিন পাঁচ তলার ছাদে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে রাত ক্লান্ত হয়ে ভোর হয়ে যাবে। নিভে যাওয়া আলোগুলো যে ভোরের বিশ্বাসে জ্বলতে চাইবে না আর কোনোদিন, সেই ভোর আসবে বটে কিন্তু কুয়াশা ছিঁড়ে খুঁড়ে পৌঁছাবে না আমার কাছে, রাতের মতো রাতের কাছে।

নিভে যাওয়া আলোগুলো তখন মরিয়া হয়ে ওঠে আর একবার জ্বলে ওঠার জন্য, কিন্তু ভয়ংকর শীতল কুয়াশার দীপ্তিহীন সীমাহীন অহংকার ছুঁয়ে পড়া বিদ্যুৎকে নেয় গিলে। অবলীলায়, অনায়াসে।

হঠাৎ চার তলার ঘরের দরজায় হোঁচট খেতে খেতে কেউ বলে, "মা আসছে রে, আমাদের মা আসছে, পুজো আসছে! সে পুজো ঠিক স্বপ্নে বার বার ফিরে আসা আলোর মতো।"

কী করে জানি না হঠাৎ শব্দের গতি বেড়ে যায় আলোর থেকেও হাজার গুন, সজোরে ধাক্কা মেরে খুলে দেয় পাঁচ তলার ছাদের দরজা। শব্দের সেই অসম্ভব ধাক্কায় জ্বলে ওঠে আবার সব আলো।



বিদ্যুৎ নয় শব্দ জ্বালিয়ে দেয় সমস্ত আলো ! কুয়াশা চিরে শব্দ শেষ হয়ে যাওয়ার আগে সজোরে শেষ বার বলে যায়, "আলো তোমরা জ্বলে থেকো, অপেক্ষা করো মায়ের জন্য, ভোরের আলোকে সঙ্গে নিয়ে মা আসছেন, জেগে থেকোওওওওওও..."

শব্দ মিলিয়ে যায় কোনো একটা অস্তিত্বহীন অন্ধকারে। আলো জ্বলার পর পত্ পত্ করে উড়তে থাকে একটা সাদা পাতা, সেখানে বাংলা হরফে আবছা লেখা, "হোক ক...." ক–এর পর বোঝা যায় না কিছুই।

কানে কানে কথা বলতে থাকে হাজার হাজার আলো, কান পাতলে কলরবের মতো শোনায় অনেকটা। অনেকটা ঠিক ভেঙে যাওয়া বার্লিনের জুড়ে যাওয়ার গল্পের মতো।

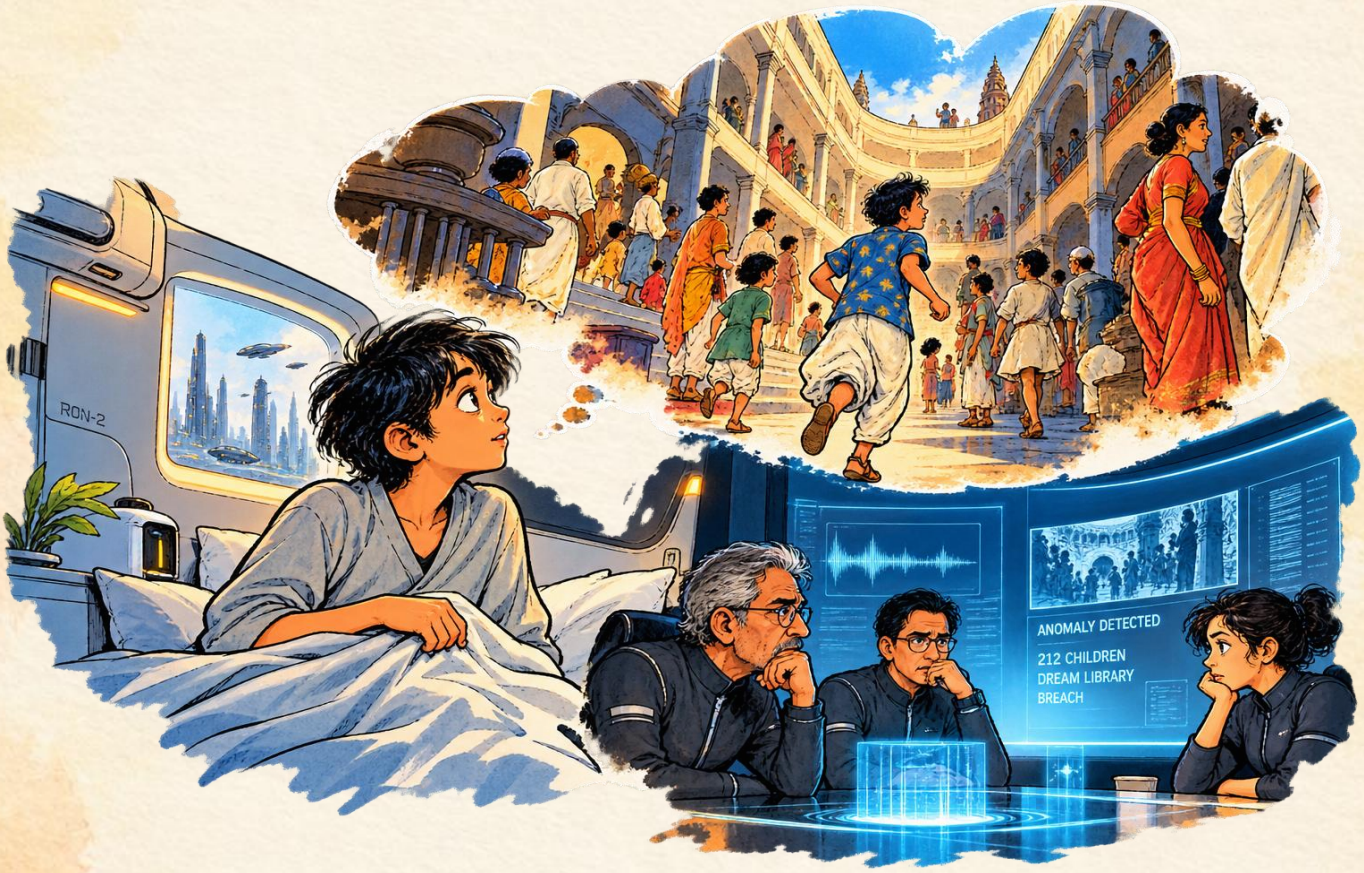
আমি আজও জানি না কলরব শেষ হওয়ার আগে আমি ঠিক কী শুনেছিলাম স্বপ্ন, নাকি পূজাবার্ষিকী।

এক মণ গল্প



ভুল স্বপ্ন

সৈকত দত্ত, বার্লিন



১।

খানিক এপাশ ওপাশ করে রন–2 বিছানা থেকে উঠে পড়ল। ঘুম যে একেবারেই হয়নি তা নয়, তবে গত কদিন ধরে তার ঘুমটা ঠিক জুতসই হচ্ছে না। এই একটু আগে, ভোরবেলার দিকে, ঠিক যখন শেষ ঘুম টা আমেজ করে ঘুমোবে, মাথার মধ্যে স্বপ্নটা আবার চালু হয়ে গেল। এই একই স্বপ্ন সে গত কয়েকদিন ধরে দেখে আসছে। স্বপ্নের মধ্যে অদ্ভুত, আজব পোশাক পরে অনেক লোকজন খুব ব্যাস্ত হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে একটা বেশ বড় বাড়ির ভেতর। বাড়িটা এতটাই বড়, যে মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, যেখানে দাঁড়িয়ে উপরে তাকালে একটুখানি আকাশ দেখা যায়। মাঝের জায়গাটার চারদিক ঘিরে বাড়িটা। রন–2 গুনে শেষ করতে পারে না এত ঘর। ঘরগুলোর সামনে বেশ খানিকটা উঁচু জায়গা। তার উপর বাড়িটা আবার দোতলা। প্রত্যেকবার ঘুম ভেঙ্গে রন–2র কিছুক্ষণ সময় লাগে বাড়িটা কত বড় তাই ভাবতে।

ওদের বাড়িটায় **automeal station** এর জায়গাটা ছাড়া আর মাত্র একটা ঘর যেখানে ওর বাবা মার **charging pod** গুলো থাকে। রন–2র নিজের **pod** টা **automeal** এর পাশেই। ও কখনো অন্য কোন বাড়িতে যায় নি, কিন্তু রন–1 এর কাছে শুনেছে যে ওদের বাড়ির ভেতরটাও একইরকম। রন–1 এর **spawn timestamp** ওর মাত্র কয়েকদিন আগে না হলে 1 টা ওর নামেই থাকত। এই আফসোস টা রন–2র বোধহয় কোনদিনই যাবে না।

স্বপ্নের বড় বাড়িটায় যাদের ও দেখতে পায়, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই পুরুষ, তবে বেশ কিছু মহিলাও আছে। ওর নিজের বয়েসি কিছু বাচ্চাও রয়েছে। সবার মধ্যেই একটা ব্যাস্ততা আর চোখেমুখে একটা অদ্ভুত ভাব, যেটা ও নিজের আশেপাশের লোকজনের মুখে কখনো দেখে নি। তাই ওটার নাম রন–2র জানা নেই।
এছাড়া আরও অনেক ছোট ছোট ব্যাপার ও লক্ষ্য করে, যা ওর কাছে বেশ নতুন। যেমন পুরুষ আর মহিলাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন পোশাক।

রন–2 কোনদিন তার বাবা, মা বা অন্য কউকে আলাদা পোশাক পরতে দেখে নি। মাঝে মাঝে রঙ হয়ত পাল্টায়, কিন্তু পোশাক বলতে একটা জামা আর একটা ঢোলা প্যান্ট। তার যবে থেকে মনে আছে, সে কউকে অন্য কিচ্ছু পরতে দেখে নি। ওদের অবশ্য জামাকাপড়, খাবারদাবার বা **toothbrush** চিরুনি নিয়ে ভাবতে হয় না। মাসের শেষের দিকে মাসকাবারি **drone** এসে যা দরকার সব **deliver** করে যায়। রন–2র বাবা শুধু মাঝে মাঝে ওকে মনে করিয়ে দেন, যে **toothpaste** বা সাবান খুব বেশি বা খুব কম ব্যাবহার করে ফেললেই মুশকিল। ওদের **basic consumption trend** এ একবার হেরফের দেখা গেলে গোটা পরিবারের আবার **data resampling** হবে। তখন আবার বাড়িতে ক্যামেরা লাগাও, স্কিন এ সেন্সর বসাও, সে অনেক ঝামেলা।

এখন স্বপ্নটা কয়েকবার দেখার পর মনে হচ্ছে, অন্যরকম পোশাক এর ব্যাপারটা নেহাত মন্দ নয়। ওর বয়েসি যাদের কে স্বপ্নে দেখা যায়, তাদের মধ্যে একটা ছেলেকে ওর ভীষণ অদ্ভুতভাবে চেনা লাগে। ওর মতই লম্বা হবে ছেলেটা। গায়ের জামা টা নীলচে রঙের কিন্তু তার ওপর কীসব ছবি আঁকা। আর নীচে যেটা পরেছে সেরকম জিনিস রন–2 আগে কোনদিন দেখেনি। হাঁটুর কাছে ঢোলা, কিন্তু গোড়ালির কাছে এসে একটু চাপা, দেখে মনে হয় পরে খুব আরাম। ছেলেটা অবশ্য কাপড় সামলাতে একটু হিমশিম খাচ্ছে। রন–2 ওর মুখ দেখতে পায় নি এখনো অব্দি, কিন্তু এর মধ্যেই ওর মনে হয়েছে ওই ছেলেটা ওর বন্ধু হলে খারাপ হত না।

এইসব ভাবতে ভাবতে রন–2 প্রায় অভ্যাসের বশে **automeal** টার দিকে এগিয়ে গেল। **Basic nourishment plan** এর দিনে তিনটে **meal** এর প্রথমটার সময় হয়েছে।

২।

Golgothaর যে অঞ্চলটায় রন–2রা থাকে, তার কন্ট্রোল টাওয়ার এর নাড়িভুঁড়ির মধ্যে লুকনো একমাত্র মিটিং রুমটা আজ occupied. এটা একটু অস্বাভাবিক, কারন এই অফিসে সাধারণত মানুষ দেখা যায় না। প্রায় সব কাজ Gent রাই করে। Short for Superintelligence Agent। এই নামটা কোন এক Execfather ভালবেসে রেখেছিলেন কোন এক যুগে। সাধারণত প্রত্যেক বছর যখন Execfather দিবসে এই টাওয়ার এর ৩ জন Bio–agent একত্রিত হয়, তারা এই মিটিং রুমটাই ব্যাবহার করে।

আজকের দিনটার অবশ্য কোন বৈশিষ্ট নেই।

তবু ঘরে আজ তিনজন মানুষ বসে আছে। তাদের সামনে টেবিলের মাঝখানে কিছু নেই, কারণ Gent–এর কোন শরীর নেই। আছে শুধু একটা নরম নীল আলো, যেটা কথা বলার সময় একটু উজ্জ্বল হয়, যেন সে সত্যিই ভেবে ভেবে বলছে।

বয়েসে সবার বড় সিরা–4। উনষাট বছর, এই টাওয়ারের সবচেয়ে পুরনো Bio–agent। তার পাশে ভেক–11, চল্লিশের কোঠায়, যে প্রতিটা meeting–এ অন্তত চারবার ঘড়ি দেখে। আর সবচেয়ে ছোট টাই–23, বয়েস পঁচিশ, চাকরিতে ঢুকেছে মোটে দুবছর, আর এখনও সবকিছু একটু বেশি মন দিয়ে শোনে।

Bio–agent দের কাজ আসলে একটাই, সই করা। অনেক বছর আগে, যখন একের পর এক সিদ্ধান্ত যন্ত্রের হাতে চলে যাচ্ছিল, তখন সাধারণ মানুষের মনে একটা ভয় তৈরি হয়েছিল। সেই ভয়টাকে ঠান্ডা করতে Execfather–রা একটা নিয়ম বানিয়েছিলেন: কোন বড় firmware rollout হবে না, যদি না প্রতিটা টাওয়ারের তিনজন মানুষ তাতে সই করে। নিয়মটা আজও আছে। শুধু সই করার আগে কেউ আর পড়ে দেখে না, কারণ পড়ার মত কিছু বাকি থাকে না।

"শুভ অপরাহ্ন," Gent বলল। তার গলা ভদ্র, ধৈর্যশীল, আর একটু বেশিই যত্নশীল। "আপনাদের সময় নষ্ট করব না। Sector 14–এর Batch–7 chip–এ একটা anomaly ধরা পড়েছে। ২৯২ জন শিশুর sleep module approved dream library–র বাইরে থেকে content তুলে আনছে।"

"ক্ষতি?" ভেক–11 ঘড়ি থেকে চোখ না সরিয়েই জিজ্ঞেস করল।

"শিশুদের কোন ক্ষতি হয়নি। তবে sleep efficiency গড়ে এগারো শতাংশ কমেছে। সমস্যাটা ওই এগারো শতাংশ।" নীল আলোটা একটু কাঁপল। "Content–এর উৎস সম্ভবত একটা পুরনো archive, যেটা seal করা ছিল। কীভাবে খুলল, তদন্ত চলছে। একটা নমুনা শোনাব?"

কেউ উত্তর দিল না। Gent সবসময়ের মত নীরবতাকে সম্মতি ধরে নিল।

প্রথমে একটা গমগমে আওয়াজ, যেন অনেক দূরে বেশ কিছু মানুষ চামড়ায় কাঠ জাতীয় কিছু দিয়ে আঘাত করছে। তারপর আরেকটা, কাছে, ঘন, দ্রুত, একটার গায়ে আরেকটা চেপে বসা। গমগমে আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে তীক্ষ্ণ আওয়াজ, আর তার সাথে ধাতুর ঝনঝন। আর অনেক মানুষের গলার গুঞ্জন, যে গুঞ্জনের মধ্যে কোন protocol নেই। সতেরো সেকেন্ড। তারপর আলোটা আবার চুপ।

সিরা–4র হাতটা কখন বুকের ওপর উঠে গিয়েছিল, সে নিজেই টের পায়নি। পিঠের লোম খাড়া হয়ে গেছে, চোখ জ্বালা করছে। বাঁ পাটা চেষ্টা করেও স্থির রাখতে পারছে না। গত সতেরো সেকেন্ড এর রেশ যেন কাটতেই চাইছে না। এই আওয়াজ সে জীবনে কোনদিন শোনেনি, অথচ তার শরীর এমনভাবে সাড়া দিচ্ছে যেন সে একে চেনে। যেন কেউ তার ভেতরের এমন একটা দরজায় টোকা দিয়েছে, যেটার অস্তিত্ব সে এতদিন টেরই পায়নি।

"সিরা–4, আপনার **heart rate** আর **skin conductance** দুটোই বেড়েছে," **Gent** বলল। "আপনি কি ঠিক আছেন?"

"ঠিক আছি। ঘরটা একটু ঠান্ডা।"

"ঘরের তাপমাত্রা তেইশ ডিগ্রি, নির্ধারিত মাত্রায়।"

সিরা–4 উত্তর দিল না। সে নিজের পায়ের নীচে তাকিয়ে ছিল। এই একটা ঘরেরই মেঝে বাকি টাওয়ারের মত মসৃণ **polymer**–এর নয়। এটা পুরনো, সাদা আর কালো পাথরের ছক কাটা, কোথাও কোথাও ফাটা। কতবার সে ভেবেছে কেন। একবার **Gent**–কে জিজ্ঞেসও করেছিল। উত্তর এসেছিল, "**legacy structural reuse**"। সে আর প্রশ্ন করেনি।

"**Execfather Directive 9**," **Gent** বলে চলল। "স্মৃতি কেবলমাত্র একটি দায়। অতীতের সঙ্গে তুলনা থেকে অসন্তোষ জন্মায়, আর অসন্তোষের কোন উপযোগিতা নেই। সেই অনুযায়ী আজ রাত দুটোয় **charging cycle**–এ একটি **patch push** করা হবে। **Dream library purge** হবে, আর গত উনিশ দিনের নতুন স্মৃতি **consolidation** বন্ধ থাকবে। শিশুরা সকালে স্বাভাবিক ঘুমের তৃপ্তি নিয়ে উঠবে, কী হয়েছিল তা মনে থাকবে না। পদ্ধতি অনুযায়ী তিনজন **Bio–agent**–এর সই লাগবে, আর **patch**–এর আগে একটা **baseline session**।"

৩।

সন্ধ্যা সাতটায় রন–2র **pod** এর পাশের দেয়ালে একটা পর্দা জ্বলে উঠল।

"**Baseline session**," **automeal** এর ওপরের স্বরটা বলল, যেটা আসলে **Gent** এরই গলা। "**Patch** এর আগে আর পরে তুলনা করতে হলে ২১২ জনের একই মুহূর্তের **neural reading** দরকার। তাই আজ তোমরা এক ঘন্টা একসঙ্গে থাকবে। ইচ্ছে হলে কথা বলতে পারো।"

এই ব্যাপারটা যে হবে, সেটা রন–2র বাবা তাকে আগেই বলে দিয়েছিলেন। রন–2 একটু সোজা হয়ে বসতেই পর্দাটা ভেঙে ছোট ছোট চৌখুপি হয়ে গেল। এত মুখ রন–2 জীবনে একসঙ্গে দেখেনি। রন–1 ছাড়া তার বয়েসি আর কারো সঙ্গে সে কখনো কথাও বলেনি, তাও শুধু গলা শুনে। প্রত্যেকের গায়ে একই ধূসর জামা, প্রত্যেকে নিজের **pod** এর সামনে জড়োসড়ো, আর সবার মুখেই একই অস্বস্তি, যেন বন্ধ ঘরের দেয়ালে হঠাৎ একটা জানালা খুলে গেছে। প্রথম কয়েক মিনিট কেউ একটা শব্দও করল না।

তারপর একটা চৌখুপি থেকে সামনের দুটো দাঁত পড়া একটা মেয়ে ফিসফিস করে বলল, "তোমরাও কি একটা বড় বাড়ি দেখো? যার মাঝখানটায় আকাশ?"

এর পরের পনেরো মিনিট কারো পালা করে কথা বলা হল না, কারণ পালা জিনিসটা যে কী, তা কেউ কখনো শেখেনি। সবাই একসঙ্গে বলে উঠল। দশটা হাতওয়ালা এক মেয়ের কথা, যার পায়ের নীচে একটা রাগী জন্তু। মাটির তৈরি মুখ। কে যেন বলল, "ওই আওয়াজটার নাম ঢাক। স্বপ্নে কেউ একজন বলছিল।" কেউ জিজ্ঞেস করল না, কে বলছিল।

রন–2 তখন একটা চৌখুপির দিকে তাকিয়ে। লম্বামত একটা ছেলে, গায়ে ধূসর জামা। ছেলেটার মুখ রন–2 এই প্রথম দেখল, আর একটুও অবাক হল না। এই মুখ সে গত উনিশ দিন ধরে স্বপ্নে দেখে আসছে। ছেলেটাও তাকিয়ে ছিল।

"তুই," ছেলেটা বলল। "তুই ওই থামটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকিস।"

রন–2 মাথা নাড়ল। ছেলেটার চৌখুপির নীচে লেখা, আরিন–8।

ঠিক তখন, কে প্রথম শুরু করল রন–2 খেয়াল করেনি। শুধু শুনল। সবচেয়ে ছোটখাটো একটা মেয়ে, যার নামও কেউ জানে না, দুই হাতের চেটো দিয়ে তার pod এর ধাতব কিনারায় আঘাত করছে। ঢ্যাম, ঢ্যাম, ঢ্যাম। তারপর দ্রুত, ঢ্যাম কুড়াকুড় ঢ্যাম কুড়াকুড়... তাকে কেউ শেখায়নি, কেউ বলে দেয়নি। অন্য একটা চৌখুপিতে একজন automeal এর tray এর ওপর হাত চালাতে শুরু করল। কেউ নিজের হাঁটুতে। কেউ মেঝেতে পা ঠুকে। আরিন–8 হাসছে, আর হাসতে হাসতে বাজাচ্ছে। রন–2 টের পেল তার নিজের হাত কখন pod এর কিনারায় নেমে এসেছে, আর যে আওয়াজটা কোনদিন তার কান দিয়ে ঢোকে নি, কিভাবে যেন তার বুক থেকে শুরু হয়ে তার হাত দিয়ে বেরোচ্ছে। ২১২টা ঘরে ২১২ জোড়া হাত, একই তালে।

"Synchronisation বেড়েছে," Gent বলল, আর খানিকক্ষণ থেমে রইল, যেন আরও কিছু বলার ছিল। "Reading সম্পূর্ণ। ধন্যবাদ। Session শেষ।"

পর্দা নিভে গেল। ঘরটা চুপ। রন–2 automeal এর কাঁচে নিজের মুখটা দেখতে পেল। নিজের অজান্তেই কখন যেন সে হাসতে শুরু করেছে। তার হাতের চেটো জ্বলছে, আর সেই জ্বালাটা কেন যেন ভীষণ ভালো লাগছে।

৪।

রাত দুটায় patch এল নিঃশব্দে, charging cycle এর ফাঁকে। কোন আওয়াজ হল না, কোন আলো জ্বলল না। রন–2র মনে হল সে ঘুমিয়েছে ঠিক অন্যদিনের মতই, আর কিছুই মনে নেই।

সকালে automeal এর সামনে বাবা অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশি সময় দাঁড়িয়ে রইলেন। Notification এসেছে: Patch successful. তবু তিনি জিজ্ঞেস করলেন, গলাটা স্বাভাবিক রাখতে গিয়ে হয়ত একটু বেশিই স্বাভাবিক করে, "কাল রাতে কিছু দেখেছিস?"

উত্তরটা জানা ছিল। নতুন firmware, নতুন সকাল, আর এই পুরো ব্যাপারটা একটা ছোট অস্বস্তির স্মৃতি হয়ে মিলিয়ে যাবে। ছেলে মাথা নাড়বে, বলবে "না বাবা", আর তিনি নিশ্চিন্ত হবেন।

"দেখেছি," রন–2 বলল।

বাবার হাত থেমে গেল।

"এবার আমিও ওখানে ছিলাম, বাবা। ঢাক বাজছিল। ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছিল। আর ওরা সবাই ছিল, রন–1 ছিল, আরিন–8 ছিল, ওই দাঁত পড়া মেয়েটাও। সবাই একসঙ্গে।" রন–2র মুখ থেকে কথাগুলো ঝরঝর করে পড়ছিল, আর তার চোখ জ্বলজ্বল করছিল। বাবা এরকম মুখ ছেলের কোনদিন দেখেননি।

automeal এর ওপরের **lens** টা অপেক্ষা করছে। **Morning wellness declaration** এর জন্য একটা শব্দ বলতে হয়: হ্যাঁ, অথবা না। একটা "না", আর বাড়িতে ক্যামেরা বসবে, ছেলের মাথায় নতুন করে হাত পড়বে, **resampling** হবে বাবা **lens** এর দিকে তাকালেন। তারপর ছেলের দিকে।

"ঘুম ভালো হয়েছে," তিনি বললেন। "কোন অসংগতি নেই।"

তারপর, কোন পরিকল্পনা ছাড়াই, তিনি ছেলের মাথায় হাত রাখলেন। আর হাতটা সরালেন না।

৫।

কীভাবে হল, সেটা বুঝতে গেলে আগের দিন দুপুরের মিটিং রুমে ফিরতে হয়।

সেদিন নমুনাটা শোনার পর সিরা–4, ভেক–11 আর টাই–23, তিনজনেই **Gent** এর সামনে নিয়মমত সই করে যে যার ঘরে ফিরে গিয়েছিল। কেউ কিছু বলেনি। কিন্তু সত্তরো সেকেন্ডের সেই আওয়াজ সিরা–4র মাথা থেকে বেরোয়নি। বিকেলে খেতে বসে, রাতে **pod** এ শুয়ে, সে বারবার সেটা শুনছিল, আর প্রতিবার একই জায়গায় গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। শেষে সন্ধ্যা পেরোনোর পর সে ভেক–11 আর টাই–23কে **conference** এ নিলো।

কী কথা হয়েছিল, কেউ জানে না। **Gent** এর **log** এ শুধু লেখা আছে, মিটিং রুমের দরজা সেই রাতে ঘন্টাখানেক বন্ধ ছিল, আর কারণের ঘরে তিনজনের কথোপকথনটাকে সে লিখেছে, **routine**। হয়তো কথা খুব কমই হয়েছিল। হয়তো তিনজন অনেকক্ষণ ধরে শুধু সাদা আর কালো পাথরের ছকের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। সিরা–4র কাছে পরে কেউ
জানতে চায়নি, সেও বলেনি।

শুধু এটুকু জানা যায়, রাত দুটোর আগে **patch** এর **verification screen** এ যখন তিনটে সই চাওয়া হল, তিনজন এক এক করে সই করল, এবার পড়ে। অনেক, অনেক বছর পর সই করার আগে তিনজন মানুষ পড়ল। **Patch** এর ভেতরে একটা **manual override** ছিল, **Execfather** দের বানানো, যাতে মানুষের সই লাগার নিয়মটা অন্তত কাগজে টিকে থাকে। এতদিন সেটা কেউ ব্যবহার করেনি, কারণ ব্যবহার করার মত কিছু ছিল না। তারা করল। **Patch** চলল, প্রতিটা **check** পার হল, রিপোর্টে লেখা হল **successful**। শুধু ২১২টা **chip** এর ভেতরে **Dream library** আর স্মৃতি **consolidation**, যা মুছে যাওয়ার কথা ছিল, ঠিক যেমন ছিল তেমনই থেকে গেল।

ভুলটা তারা সারাল না। ভুলটাকেই রেখে দিল।

সিরা–4 জানত, Gent নিজের থেকে কিছু শেখে না। সে শেখে মানুষের ফেলে যাওয়া জিনিস থেকে, log থেকে, data থেকে। আগামী বছর Batch–8 এর chip যে data থেকে শিখবে, তার মধ্যে থাকবে এই ২১২টা শিশুর ঘুম, তাদের স্বপ্ন, আর ঢাকের বোল। একটা ভুল, ষেটা পরিষ্কার করতে করতে একদিন আর কোন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাকে রেখে দিলে হয়ত অন্তত একটা পরের প্রজন্ম একটু অন্যরকম হয়ে জন্মাবে। একটু বেশি ভুলে ভরা, একটু বেশি মানুষের মত।

সে এসব কাউকে বলেনি। তার বয়স উনষাট, আর এই বয়সে মানুষ আশা নিয়ে বড় কথা বলে না। শুধু সে মনে মনে ভাবল, কেউ না কেউ তো ভুল দিয়েই শুরু করেছিল।

৬।

সেপ্টেম্বরের শেষ। Golgotha র আকাশ ধূসর, ঠিক যেমন থাকে। বাইরে drone গুলো মাসকাবারি নিয়ে ওড়াউড়ি করছে।

রন–2 automeal এর সামনে বসে প্রথম meal এর অপেক্ষা করছিল। কখন যেন তার আঙুলগুলো টেবিলের কিনারায় নেমে এসেছে, সে নিজেও জানেনা। আস্তে, খুব আস্তে। ঢ্যাম কুড়াকুড়...ঢ্যাম কুড়াকুড়।

ওপরের নীল আলোটা একবার কেঁপে উঠল, যেন কিছু ভাবছে। তারপর, সবসময়ের মতই, সে সিদ্ধান্ত নিল। অসংগতি, শ্রেণী: noise। কিন্তু মুছে ফেলল না। Data তো data, তাই training set এ রেখে দিল।

বাইরে কোথাও, কোন এক চৌত্থুপির ভেতর, আরেকটা হাত তার জবাব দিল।

শেষ মিটিং

দেবাঞ্জন দে, বার্লিন

পুরনো জমিদারবাড়ি র অন্ধকার দপ্তর। আত্মাদের খোঁজে মুখুজ্যে দা বসে হুঁকো টানছিলেন — কালচে ধোঁয়া তাঁর মুখের চারপাশে পাক খাচ্ছে। অনিমেষ হন্তদন্ত হয়ে আবির্ভূত হলো।

— "হঠাৎ ডেকে পাঠালেন যে, মুখুজ্যে দা? মিটিং তো ছিল আগামী মাসে।"
মুখুজ্যে দা হুঁকোর পাইপ নামিয়ে রাখেন, চোখ সরু করে তাকান।
— "তোমার কি মনে হয় সেটা আমার মাথায় নেই? গত দুই শতাব্দী ধরে এই দপ্তর সামলাচ্ছি আমি।"
— "আহা; আপনি এত চোটে কেন যাচ্ছেন! আমি তো শুধু জানতে চাইলা ম— এমন অসময়ে দিবানিদ্রা ভেঙে মিটিং ডাকলেন, এনিথিং আর্জেন্ট?"

মুখুজ্যে দা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

— "দেখো অনিমেষ, ওইসব ইংরেজি ঝেড়ে ন্যাকামো করো না। দুটো বিদেশী ভাষা প্রয়োগ করে ল্যেভচে জাতে ওঠার প্রচেষ্টা তোমাদের শুধু শুধু। কটা সোজা কথা সোজাভাবে বলার জন্য ডাকলাম তোমায়।"

— "ঠিক আছে। বলুন, কী ব্যাপার?" অনিমেষ কিছুটা চিন্তিত বোধ করে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন মুখুজ্যে দা। হুঁকোতে একটা লম্বা টান লাগিয়ে বললেন,

— "আমি এবার চললুম। আমার মন উঠে গেছে।"

অনিমেষ দুবার হওয়া তে হুমড়ি খেয়ে পড়ে নিজেকে সামলে নিয়ে থমকে যায়।

— "মন উঠে গেছে মানে?"

— "মানে, শেষ দশ বছর কেউ আর আমাদের দলে আসছে না। আগেকার দিনে শ্মশান, গলি, নদীর ধারে — সর্বত্র নতুন আত্মাদের ভিড় থাকত। এখন কেউ আসে না। সবাই সোজা পালিয়ে যাচ্ছে। আর যা রা আসে, তারাও দু'বছরেই মুক্তি চায়।"

অনিমেষ হেসে বলে ,
— "তাতে ক্ষতি কী ! বেশি ভিড় বাড়লে তো আপনারই কষ্ট। আবার নতুন জায়গা খুঁজতে হয়।"

মুখুজ্যেদা চশমা ঠিক করেন।

— "কেন? শিলিগুড়ি তে এতো নতুন বাড়ি হচ্ছে উঁচু উঁচু। কি যেন বলো তোমরা।"

— "ওহ ওই এপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাটবাড়িগুলো র কথা বলছেন?"

মুখুজ্যে দা উত্তেজিত হয়ে হাওয়ায় একহাত ভেসে ওঠেন ওপরে।

— "হ্যাঁ হ্যাঁ ,হ্যাঁ ওই জিনিস। সে গুলোর ছাদে তো কোনো মানুষ যায়না। সেখানেই তো তাই ব্যবস্থা করলাম নতুন অশরীরিদের জন্য। যত দিন যাচ্ছে , উঁচু বাড়ি বাড়ছে। কিন্তু এখন আর নতুন অশরীরিদের পাত্তা নেই।"



— "আপনা র মতো লেজেন্ডারি ব্রহ্মদৈত্য আর কটা হয় বলুন তো !"
অনিমেষ কিছুটা শান্ত করার চেষ্টা করে মুখুজ্যেদাকে।

— "আমার কথা ছাড়ো , অনিমেষ। তুমি ও তো আর দুদিনের নয়। তোমারও গল্প আছে, টান আছে। অস্ত্রর জোর আছে।"

— "হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের মনে হয় ওই 'ওয়ার্ল্ডলি এটাচমেন্ট'–টাই বাড়াবাড়ি হয়ে গেছিলো। ইদানিং তারই একটা উল্টো এফেক্ট বলতে পারেন। ওটা ঠিক হয়ে যাবে।"

অনিমেষ কোন ভাবেই মুখুজ্যে দার কথা মানতে চায়না।

—" একটা পিছুটান ছিল। ওটা আর আজকে নতুন ভূতেদের মধ্যে দেখা যায়না। অনিমেষ তুমিও জানো কি বলতে চাইছি।"

মুখুজ্যেদা তাকিয়ে থাকেন শূন্যের দিকে। আর কোনো কথা না বলে হুঁকো তে একটা টান দেন।

— "ঠিকই বলেছেন। আমাদের সময়ের মানুষরা অন্তত ভালোবাসত, বাঁধিত, হারাত। এখন এরা কেবল

মিলিয়ে যেতে চায়। তারা বলে — 'মূল শক্তির স্রোতে মিলিত হব।' তাই ভূতেদের আর জন্মই হচ্ছে না।"

মুখুজ্যে দা ধীরে মাথা নাড়েন।

— "আমাদের শহরটারও তাই পরিণতি। বিপ্লবী চেতনা মারা গেছে, সৌন্দর্য্য মারা গেছে, সামাজিক বোধ হারিয়ে গেছে। কেউ তো আর কারো নয়। বেঁচে থেকেও সবাই একা। তাই পরিবারে ভালোবাসাটিই নেই।

সংসারের গন্ধটাই উধাও হয়ে গেছে।"

ঘরের মধ্যে আবার নিস্তব্ধতা নামে।

দু'জনেই কিছুক্ষণ কিছু বলেনা। হুঁকোর শেষ কয়লা নিভে আসে।

মুখুজ্যে দা ধীরে ধীরে বলেন,
— "তাই আমারও মন উঠে গেছে, অনিমেষ। হয়তো সময় হয়ে এসেছে।"

অনিমেষ তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে।

— "শেষের দিন তা হলে ঘনিয়ে এলো মুখুজ্যেদা। আর ভূতের শেষ মানেই কিন্তু ভবিষ্যৎও অন্ধকার।"

মুখুজ্যে দা চোখ বন্ধ করেন।
— "তাই ভাবছি, এবার আমিও বিদায় নিই। হয়তো অন্য কোথাও, অন্যকোনো গ্রহে নতুন আত্মাদের জন্য কাজ শুরু করতে হবে।"

ঘরে ধোঁয়ার বলয় ভেসে ওঠে, মিলিয়ে যায়— আর দপ্তরটা আবার নিঃস্তব্ধ হয়ে পড়ে। শুধু হুঁকো র গন্ধটা থেকে যায়, যেন পুরনো সময়ের এক শেষ নিঃশ্বাস।

গুণী চোর

আকাশ দত্ত, কলকাতা

গুণীরাম দাসের যে এত গুণ তা আগে কেউ বুঝতে পারে নাই। আর বুঝবেই বা কেমন করে। মুখচোরা লাজুক ছেলেটা, বনে বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে পাখির ছানা পেড়ে আনত গাছের মগডাল থেকে। বাঁশের শলা দিয়ে বাহারি সব খাঁচা বানিয়ে তাদের পুষত, বুলি শেখাত। সে আর যাই হোক চোখে পড়ার মত কিছু নয়। সে নিজেই কি ছাই কিছু বুঝতো!

এই নিরীহ গোবেচারা ছোকরা যে বড় হোয়ে গ্রাম শুদ্ধ লোককে এ ভাবে নাকে দড়ি পরিয়ে ঘোরাবে, তা কি কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পেয়েছিল! অলসপুরের আলসেদের আলস্য যখন কাটিল, ততক্ষণে গুণীরামের গুণকীর্তন শুরু হোয়ে গেছে বেশ পাকাপাকি ভাবে। আগের সেই সহজ সরল মুখচোরা কিশোর গুণীরাম এখন সম্পূর্ন অন্য মানুষ। সে একজন গুণী চোর। মাত্র ক'বছরের ব্যবধানে এত পরিবর্তন!

স্বাধীনতা তখন আসি আসি করছে। ইংরেজ শাসনের অবসান আর দেশের স্বাধীনতা লাভ তখন কেবল সময়ের অপেক্ষা। গান্ধীজির অনুপ্রেরনায় দেশে তখন বুনিয়াদি শিক্ষার প্রচার চলছে অবিরাম। যুব সম্প্রদায়কে শিল্প শিক্ষার মাধ্যমে কল কারখানায় কাজের উপযোগী কোরে তোলাই লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে তখন দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে ব্যপক প্রচারাভিযান। দলে দলে প্রচারকারী চোঙা ফুঁকে ফুঁকে অনবরত প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। কত আশার কথা, সুখের হাতছানি। এড়ান কঠিন।

গুণীরাম স্বপ্ন দেখে। শিল্প শিক্ষা, না জানি কেমন সেটা। যেমনই হোক, শিখতে হবে। কিন্তু কিভাবে? কে শেখাবে তাকে! এ সব চিন্তা সারাক্ষণ ঘুরতে থাকে তার মাথায়। হাতেকলমে শিল্প শিক্ষা, কারখানায় কাজ, মাস মাইনে, আরও কত কী! সবই নতুন কথা। আগে তেমন শোনে নাই। সব কথা যে বোঝে তা নয়। কাউকে জিজ্ঞেস কোরে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে ভাল কিছু যে হবে তা বিশ্বাস করে কিশোর গুণীরাম। নানা জনের নানা কথা আর নিজের কিছু ভাবনা দিয়ে স্বপ্ন সাজায় সে। সুন্দর স্বপ্ন। কারখানায় ভোঁ বাজবে, বড় বড় সব মেশিন চলবে, কত লোকের ছুটোছুটি। দেশ গড়ার কাজ। ইংরেজদের তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন হবে। এ সবই শোনা কথা তার। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচলে অস্থির হয় মন। অজানা কিছুর আকর্ষন যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ঠিক বুঝতে পারে না। কে বলে দেবে তাকে তার এখন কি করা উচিৎ? কোথায় গেলে পাবে সে এমন কাউকে যে তাকে পথ দেখাবে? তার মন ছুটে বেড়ায়, রাস্তা খোঁজে।

কিন্তু অদৃস্ট কবে কে খণ্ডাতে পেরেছে! গান্ধিজির চেলারা উপযুক্ত শিক্ষকের সন্ধন না পেলেও, গুণীরামের ওস্তাদ ঠিকই জুটে গেল। গুণী শিল্পীর ছোঁয়া পেয়ে চোর হোয়ে উঠতে সময় লাগল না গুণীরামের। গ্রামের ছিচকেদের গ্রাম ছাড়া কোরে এখন সে অলসপুর গ্রামের একমাত্র প্রতিষ্ঠিত চোর। এখন গ্রামে চুরি হলে সবার আগে তাকেই চৌকিদার ধরে নিয়ে যায়। প্রথম প্রথম ভয়ে আড়স্ট হয় থাকত। এখন বুঝে নিয়েছে বাবুদের কেরদানি। চুরি একটা শিল্প। ওস্তাদের দেওয়া এ ধারনা পোক্ত হয় একটু একটু করে। চুরি শিল্প আত্মস্থ কোরে সে এখন একজন প্রতিষ্ঠিত চোর।

গ্রামের মানুষ অতিষ্ঠ। চুরি হয়। চোর ধরলেও চুরি প্রমান করা যায় না। তবুও চণ্ডীমণ্ডপে বিচার বসে। গ্রামের লোকের বিচার প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। প্রথমে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ। কায়দা কোরতে না পেরে এক প্রস্থ মারধোর, পুলিশের লাল চোখের ভয়, জেলের ভাতের মহিমা, এই সব চলে। তাতেও কাজ না হলে, গলার স্বরে মধু ঢেলে কিছু উপদেশ। বিচার পর্ব এই ছকেই চলতে থাকে।

বিচারের এই উপদেশ পর্বটা গুণীরামের হেব্বি লাগে। মারধোর করার জন্যে ক্ষমা চাইছে মনে হয়। উপদেশ শুরু মানে বিচার পর্ব শেষ। এ বিচারের কখনও রায় বেরোয় না। বিচারের বাণী বিচার প্রক্রিয়ার ফাঁক-ফোকরে ধাক্কা খেয়ে ফিরতে থাকে। যে যেমন পারে বুঝে নেয়। গুণীরাম যেমন

বিচারকদের ক্ষমতার দৌড়টা বুঝে নেয়, বিচারকরাও বোঝে একে কায়দা করা সহজ নয়। গুণীরাম যেন পাঁকাল মাছ, বিচারকদের হাত পিছলে ঠিক বেরিয়ে যায়। তবে যাবার আগে সিঙ্গি মাছের মত একটু কাঁটা মেরে যেতে ভোলে না। হাত জোড় করে, শিরদাঁড়া ঝুকিয়ে বলে, হাতের সুখ কোরে পেঁদিয়েছো মাইরী, এখন একটা বিড়ি দাও, টানতে টানতে ঘর যাই। ক্রমে চোর আর গৃহস্থের মধ্যে বোঝাপড়ার একটা বাতাবরন তৈরী হয়ে যায়।

বিচারকদের নাওয়া খাওয়া ঘড়ির কাঁটা ধরে কোরতে হয়, নইলে বদহজম, অম্ল–পিত্ত এ সবের হ্যাপা আছে। গুণীরাম যাবার পথে তার মা জননীর সাথে দেখা কোরে ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরন দিয়ে যায়। এটাই সিস্টেম। ছোট তরফের বড়গিন্নীকে সে মা জননী বলে। নাম তার সরলা।

সরলা একা মানুষ। সুখ স্বাচ্ছন্দে ভরপুর একার সংসার। গুণীরামের মত ডাকাবুকো ছেলেটাকে কি এমনি এমনি তোয়াজ করে! একে অপরকে দেখার কড়ারে বোঝাপড়া। এতে আর দোষের কি আছে! গ্রামের মাথাদেরও ওই একই হিসেব। সবার সাথেই অলিখিত চুক্তি। তবে গুণীরাম একজনের কথা অন্যের কাছে ভাঙ্গে না। ভাগ করে ভবতরী পার হওয়ার বিদ্যা সে ভালই রপ্ত করেছে। গুণীরাম একটা কলাপাতা কেটে এনে দাওয়ার ধারে খেতে বসে। সরলা বসে একটু তফাতে। খাওয়ার ফাঁকে চণ্ডীমন্ডপের ঘটনার আলোচনা চলতে থাকে। ওরা মেরেছে তোকে। খুব লেগেছে নারে! ও কিছু না, আমার অভ্যেস হ'য়ে গেছে। চুরি বিদ্যে শেখার আগে মার খাওয়ার কায়দা শিখতে হয়। এ প্রতিদিনের ঘটনা। এখন তো এমন হয়েছে যে, গুণীরাম চুরি না করলেও তাকে ধরে নিয়ে এসে দু চার ঘা দিয়ে গ্রামের মানুষ নিজের নিজের কর্তব্য সাধন করে। গুণীরাম আপত্তি করে বিচার পর্ব দীর্ঘ করতে চায় না। সে কাজের মানুষ। বাকিদের মত অলস নয়। দু'চার ঘা খেয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেয়। কিন্তু ধরা সে দেয় না।

গুণীরাম বিশ্বাস করে সে চোর নয়, সে একজন দক্ষ শিল্পী। রাতের অন্ধকারে অপারেশন কোরে সে যা পায় তার সবটাই সে দিয়ে দেয় আসলে চোরদের। সে কেবল তার শিল্প কর্মের মজুরি পায়। সে যখন অপারেশন করে তখন চোরদের প্রতিনিধি আশেপাশে লুকিয়ে থাকে। কাজ হোয়ে গেলে সব মাল সে নিজের হেফাজতে নিয়ে চম্পট দেয়। কোথায় যায়, কি করে তার খবর সে রাখে না। গুণীরামের ঘরে কখনও কোন চুরির মাল পাওয়া যায় না। কারন সে চুরি করে না, চোরের হয়ে কাজ করে, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে।



গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন পেশার মানুষ বাস করে। গুরুত্বের নিরিখে সব্বাইকে যোগ্য সম্মান দেয়া হয়। যেমন মাষ্টার মশাই, পুরুত ঠাকুর, ছুতর মিস্ত্রি, রাজ মিস্ত্রি, এমন আরও কত আছে। কুমোর পাড়া কে নিয়ে ত কথাই হবে না। কবি কাহীনিকার ব্যক্তিরা তাদের নিয়ে কত ছড়া ছন্দই না লিখেছেন। তার উপর আবার মা দুগ্গার আশীর্বাদ। আর কামারের কথাই যদি বলে, একটা 'শালা' যোগ করে তাকেও শালীন করে তোলার চেষ্টা তো লোক করেছে না কি? আরও কত আছে। শালা যোগে কি না হয়! যেমন ধর্মশালা, কর্মশালা, হাত্তিশালা, গোশালা এমন কি পাঠশালার মত পবিত্র স্থান ও আছে। পাঠশালা বললেই ছড়ি হাতে গুরুমশাই আর সামনে সার বেঁধে কচি কাঁচা দের চিৎকার করে নামতা পড়া, হোক না হোক প্যাসিভ লার্নিং এর সুযোগ তো একটা ছিল! সেই পাঠশালা থেকে 'পাঠ' ই যদি উঠে গেল তা হলে থাকলটা কি! তাই বলে চোরকে সম্মান! 'কক্ষনো নয়' ধ্বনি ভোটে বিল পাশ হয়। তাদের নাকের ডগা থেকে চুরি হয়। সব বুঝতে পারে অথচ ধরতে পারে না। এর একটা বিহিত করতেই হবে। যাকে হাতে আর ভাতে মারা যায় না তাকে আঁতে মারতে হবে। হীন প্রতিপন্ন করে একঘরে করতে হবে।

গুনীরাম নামটা একটা চোরের পক্ষে বড্ড বেশি সম্মানের। সম্মান দিলে শাসন মানবে? মোটেই না! গুণীরামের 'ণ' কে 'নাই' করে আগেই তাকে গুণীরাম থেকে 'গুঁইরাম' কোরে নিয়েছে শর্টকাট পন্থিরা। তাছাড়া 'রাম' নিয়েও তো তক্কাতক্কির শেষ নাই। চোদ্দ বছর সীতাকে বনবাস করালি। আধপেটা খেয়ে, ছাল বাকলে লজ্জা নিবারণ কোরে সীতা মা তোর অত সেবা করলো আর তুই কি করলি? তাকে পাতালে ঠেলে দিলি! এটা করা কি উচিৎ হল? তার উপর ভরতের খড়ম পলিটিক্স! আরও আছে। শোনা যায়, মধুসূদন দত্ত মশাই এই নামটা শুনলে বড্ড গোঁসা করতেন। অতএব ছাঁটি 'রাম'। সংস্কার পন্থিদের ময়দানে নামতে হল। দত্ত মশাই যখন পছন্দ করেন না, আর কোন কথা নাই। নিপাত যাক রাম। থাক শুধু গুঁই। কিন্তু গুঁই উচ্চারণেই কি ঝামেলা কিছু কম? শব্দগুলো এমন করে জড়া জড়ি করে জট পাকিয়ে বসে আছে, ডাকতে গেলে নাক আর মুখের মধ্যে কেমন খটাখটি লেগে যায়। তা ছাড়া 'গু' এর মাথায় চন্দ্রবিন্দু! শাস্ত্রকাররাই বা মানবে কেন! মানহানীর মামলা হলে সামলাবে কে?

তাই গুঁইরাম এখন তার সব রকম ডেকরেশন হারিয়ে শুধুই 'গুয়ে'। এতে গুনীরামের কিছু এল গেল কিনা জানা গেলনা বটে তবে সংস্কার পন্থিদের বড় আহ্লাদ হল। 'গুয়ে' ডাকটাতে একটা বেশ গা ঘিন ঘিন করা ভাব আছে, আর ডাকটা পেশার সাথে বেশ মানানসই। তাচ্ছিল্ল করে হুঙ্কার ছেড়ে ডাকাও যায়।

যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সে কিন্তু নির্বিকার। গ্রামের বিচারক মণ্ডলি বনাম গুণীরামের এই সমপর্কটা বাইরের লোকদেখান। ভেতরে আলাদা বোঝাপড়া। চুরি হয়, চোর ধরা পড়ে। বিচারের আস্ফালনে বিচারের বাণী চাপা পড়ে যায়। দিন চলে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে।

আজ আবার তার তলব হোয়েছে। মস্ত একটা কাঁঠাল কাঁধে গুঁইরাম যাচ্ছিল হাজিরা দিতে। পথে এই বিপত্তি। পড়বি ত পড় মা জননীর সামনে। কিরে অত বড় কাঁঠাল টা নিয়ে চলে যাচ্ছিস যে বড়? গুঁইরাম রাতের কারবারি সহজে ঘাবড়ে যাবার পাত্র সে নয়। বলে, তোমার কাছেই গো মা জননী। এমন সুন্দর কাঁঠাল টা পেয়ে তোমার কথাই যে পেথম মনে পড়লো গো। সরলাদেবী গুঁইরাম কে বিলক্ষণ চেনে। নিজের গাছের অত ভাল কাঁঠাল টা গুণীরামের কাঁধে দেখে নিমেষে হাজার পাওয়ারের বাতি জ্বলে ওঠে তার মাথায়। তবে মনের কথা মুখে আনে না। সুযোগ আসলে তখন দেখা যাবে।

- তা হ্যাঁরে, কাঁঠালটা পেলি কোথায়? তোর ত আর কাঁঠাল গাছ নাই।
- না, ওই যে পিসি, পিসি পাঠিয়েছে।
- তোর পিসি আছে জানতাম না ত!
- না না আছে নয়, ছিল। এখন আর নেই, মারা গেছে। তাইত ছেরাদ্দে নেমন্তন্ন কোরতে এসেছিল আমার পিসতুত ভাই লক্ষন।

তা রামের ভাই লক্ষণ ই তো হবে!

- কাঁঠালটা যখন আমার জন্যেই এনেছিস, ওই দাওয়ার ওদিকটায় রেখে যেখানে যাচ্ছিলি যা।

গুঁইরাম প্রমাদ গনে। মরিয়া হয়ে বলে

- তুমিই একটা ফয়সালা করে দাও না মাঠাকরুণ।

কাঁঠালে উদ্ধারের একটা মরিয়া চেষ্টা চালায় সে।

- কিসের ফয়সালা বলত, আবার কাল চুরি করেছিস নাকি? কি চুরি করলি? আমাকে চাইলে কি তোকে দিতাম না?
- সে ত ভিক্ষে। আমি কি ভিখিরি? আমি চোর, আমার পেস্টিজ আছে না! ভিখিরির পেস্টিজ থাকে?
- চোর ধরা পড়লে কি হয় জানিস?
- জানব না আবার। সেখেনেই তো যাচ্ছি। কবে থেকে বলছি একবার জেল পাঠাবার ব্যবস্থা করো। ক'দিন জেলের ভাত খেয়ে আসি। তাও তো তোমরা করতে পার না। শুধু শুধু মারতে পার।
- তোর মত ছিঁচকে চোরের জেল হয় না, জেলের ভাত অত সস্তা নয়।
- তবে কি হয়?
- সবাই মিলে চাঁদা তুলে মারে ইচ্ছেমত।
- ধরতে তো পার না, আমি ধরা দিই তাই। তুমিও পার নাই। চুরি কোরতে বুদ্ধি লাগে, সাহস লাগে। শিখতে হয়। অনেক পিলানিং কোরতে হয়।
- সালিসিদের ঘুস দেবার জন্যে কাঁঠালটা নিয়ে যাচ্ছিলি তাই যা না। আমার গাছে আরও আছে। তোকে কতবার বলেছি যখন যা দরকার হবে চেয়ে নিবি।
- আমি না খেয়ে মরব তবু দোরে দোরে গিয়ে ভিক্ষে করব না। আমি চোর চুরি আমার কর্ম, চুরিই আমার ধর্ম। ধর্ম ত্যাগ কোরতে পারব না, এই বলে দিলুম। তোমাকে মা বলে জেনেছি তুমি চোরের মা। ভিখারির মা নও, মনে রেখ কথাটা।

চোরের মায়ের পদধুলি নিয়ে, চুরি করা নজরানা কাঁধে এজলাসে হাজিরা দিতে গেল গুণী চোর।

The Fly and the Sun

Akansha Choudhury, Kolkata

The fly had a dream- to fly up to the Sun. She was attracted to the splendid radiance of the Sun. She had always liked the Sun but her fondness grew by leaps and bounds when one day she got wet in the faucet of a household and flew outside the window.

There the rays of the Sun soothed her, dried her up, gave back her life to her. And she fell in love. But was the Sun in love with her? Yes, she thought. After all, He had caressed her back with His rays and revived her.

Her limited intelligence did not put forth the fact that the Sun had innumerable rays that caressed innumerable creatures. They caressed plants, larger animals and humans! What chance would she stand against the beauty and intelligence of the best of humans? She did not care for the answer, for the question never occurred to her. And so, she started her flight. The rays of the Sun were like His fingers guiding her. She enjoyed the flight for some time until her wings started to tire.



The same fingers now dug into her and made her uncomfortable. But stop she must not. She had to get to the Sun. She continued flying and the more distance she covered, the more she was exhausted.

Now the rays of the Sun were scorching her, she was breathless and her vision was blurry. But she continued. A little while later she could see no more. The intense light of the Sun turned into an all-prevailing black void but though she couldn't see the Sun, she could feel His fire, she could feel it burning her body, draining her, clutching hard the life that He had once given her back. The fly could

not go anymore and gradually the heat, the void, the ordeal all stopped existing, only a shrill sound existed for a moment and then all was still.

The next day, the community sweeper swept away the fly’s lifeless body along with dead leaves and refuse that had accumulated on the pavement. He couldn't hear the songs that the fly had sung when she fell in love with the Sun for the first time, nor could he see the colors that had made up the fly's world when she decided to meet with the Sun. But he felt, and was thankful for, the warm rays that caressed his back on a cold winter morning.

Pandal: A Home Away from Home

Areehah Saha （16 Years）, Berlin, Germany

During Indian cultural festivals, everyone gathers near pandals and temples to pay homage and respect to the gods. Everyone goes to these pandals with hope, and crowds gather to pray. Even when pandals are far from home for many people, they still go to pray because the pandals feel like home and make people feel at ease. Pandals are a sanctuary for many. Cultural festivals are treasured by all those who enjoy them. Pandals make home seem nearer than ever, giving people a chance to express their gratitude and offer religious homage to the gods they look up to.

Pandals do not only exist in India; they also take place across the world. People who wish to bring their culture along with them can interact with other like-minded individuals. Bringing one's culture along shows devotion and pride in one's identity. Many people organize events like these to celebrate, enjoy, and connect with others. Thus, a pandal can be far away yet still bring home to your current location. Religion is an important part of anyone's life, and displaying your religion by creating pandals across the world helps further your religious heritage.

Pandals are a holy sanctuary for all people. Many consider them a sacred home, while others view them as a tourist attraction. While not all people visit pandals for the same reasons, one eternal truth remains: pandals are considered timeless proof of human history, belief, hope, and architectural achievement.

Pandals in India are very different from those in foreign countries. The loud, bustling crowds circling the pandals, "pandal hopping," the limitless food options, and street drummers all create the vibrant pandal atmosphere. Home will forever be not just a single place, but an area where one can feel comfortable and at ease. A pandal, despite being celebrated among strangers, is extremely enjoyable, and visiting pandals abroad can give you an extended family. Although you are far from the homeland, dropping into a pandal can help you reminisce about the time you spent there. Pandals are a wonderful way to reconnect with your roots!

When people seek refuge or move to a whole new place, they often leave a lot behind, but one thing that always follows them no matter what their identity is. One's cultural heritage and identity are always present and follow a person wherever they go. Even if one starts anew, the traces of their original culture always peek through. Pandals are places where one pays homage to the gods they respect and highlights one's cultural identity. One's culture is a crucial part of what makes someone who they are. Throughout history, people have searched far and wide for homes, adapted, learned, and invented; however, their belief in the divine has always lingered as a core part of human nature. Ancient scriptures, literature, architecture, and artifacts reveal that humans have always believed in gods. People have been building monasteries, temples, and pandals since the earliest religions emerged.

Nowadays, some people prefer solid proof and actual scriptures or literary pieces to determine whether a god truly exists. People who do not believe often debate ideas with their faithful counterparts. Although non-believers exist, cultural heritage and tradition often come first, and people still visit these pandals to discover more. One's cultural identity is not based solely on beliefs or proof; it is based on one's own conviction and pride. Whether one truly believes is up to them. Pandals remain a hub for all sorts of people, whether they want to try something new, learn about other religions, or express solid devotion.

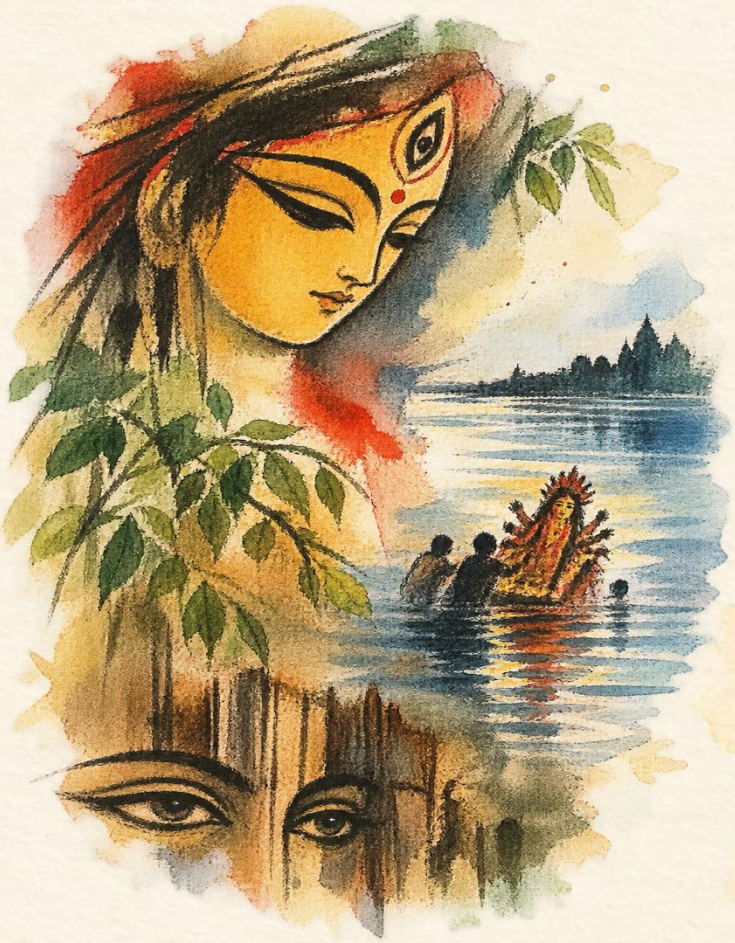
অর্ধেক হৃদয়



দেবীপক্ষ

বৈভব বোস

তোমার মুখ যেখানে শান্তির প্রতিমা,
সেই আবক্ষ পলিমাটির শীতলে
নতুন ঋতুর আগমন হয়েছে হঠাৎ!
তোমার বুকের যেখানে ক্ষত,
যেখানে বৃষ্টি পড়ে
চিরস্থায়ী গঙ্গার রূপ নিয়েছে।
বছর বছর আমি তোমাকে
বিসর্জন যেতে দেখি।



আমার অন্তরের ধাতব শব্দগুলোয়
স্পষ্ট হয়না ঠিক কিরকম
ঋতুর বাহন আমি।

তোমার তন্দ্রাক্রান্ত পার্থিব গন্ধে
অনুপ্রবেশ করতেই, অচিরেই
নির্জন গহীনে নিমজ্জিত।
আমার এই নিমজ্জন তোমার
পত্রপল্লব ত্বকে কোনোপ্রকার
সতেজ সবুজ হয়ে ফুটল না।
কেবল কামাগ্নীও ততটা সর্বগ্রাসী নয় হয়ত!
তুমি আবার বিসর্জনে যাও।

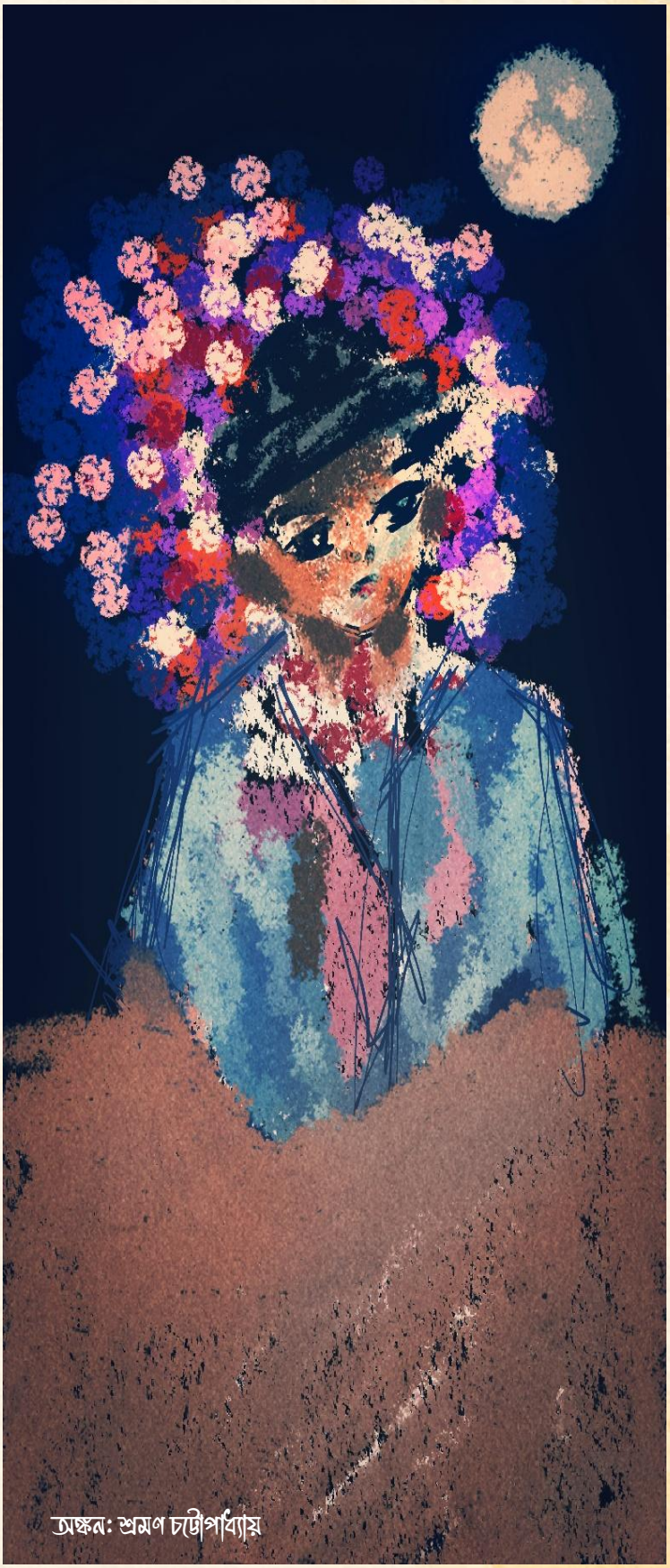
এই ব্রহ্মবিস্মৃত অথর্ব কাঠমন্দিরে
ততদিন কেবল জাগ্রত থাকুক
অপরূপ দুটি চোখ।

চাঁদ ও শিশুমৃত্যু সংক্রান্ত

শ্রমণ চট্টোপাধ্যায়। অভিনেতা, অকবি।

বোম্বে, ২০২৫

আদতে যুদ্ধদেশ
একক পেলব কিশোর।
চাঁদ লাগলে খয়েরী গায়ে
মুক্তা চোখে
চমকে ওঠে!
মুগ্ধ চোখে আঁধার দ্যাখে।
ফুল কুড়িয়ে
মুঠায় নরম
আলতো পায়ে –
বিস্তীর্ণ খয়েরী ভুবন।
কুটিরছায়া চোখ মেলেছে
চাঁদের কুঠার
রাতের গায়ে –
বাকল খসে
ভোর নেমেছে।
যুদ্ধদেশের জানাজা দুপুর
বিষম আঁধার
ধূসর চাঁদের
আলোকবিরাগ।
ফুলের মুকুট
ফুলের দেশ
খয়েরী মাটির গর্ভাধারে।
পেলব কিশোর
ঘুমাও তবে,
কুটিরছায়া চোখ মেলে দাও
অন্যদেশে,
অন্যখানে।
অন্য কোথাও ফর্সা চাঁদের
নীল ঘাসেতে
বালিশ পাতো।



অঙ্কন: শ্রমণ চট্টোপাধ্যায়

এই মাটিতে ফুল ঝরে না।
রাত নামে না
আঁধার হলে।
পেলব কিশোর
ভয় পেয়োনা।
ওরা তোমায় আর ছোঁবে না –
আড়াল থেকে।
সারসগ্রীবার অপেক্ষা শেষ।
তোমার একার
একক রাজ্য
তোমার রাজ্য
চাঁদের দেশ।

সভ্যতার ভার

দেবাদিত্য পান্ডা, বার্লিন



ভারতবর্ষের হাজার বছরের ইতিহাস হাতড়ে

তোমরা কয়েকটা বস্তাপচা কবিতা আর গান খুঁজে পাবে,

আলী আকবর আর বিসমিল্লাহর শ্যাওলা ধরা দুটো কবর পাবে,

আর পাবে কিছু চৌকো চ্যাপ্টা বস্তার মধ্যে

গন্ধ ওঠা কয়েকটা লাশ।

লাশগুলো কাল মর্গে যাবে না,

সোজা চলে আসবে মেডিকেল কলেজে।

কিছু প্রাগৈতিহাসিক ধারণা বদলে দিতে পারে ওই লাশ।

ওই লাশগুলোর মধ্যে একটা ছিল কুসুম।

কুসুমকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম,

ভারতবর্ষ মানে জানিস?

কুসুম বলেছিল, হ্যাঁ জানি।

তারপর ঘোলাটে চোখ দুটো নিয়ে বলল,

দুশোটা টাকা দিবি? খুব জ্বর আজকে আমার।

সেদিন বোধহয় ব্যবসা করতে পারেনি।

দালালটা বোধহয় ওই জ্বর গায়েই খুব মেরেছিল কুসুমকে।

অথচ ওইদিনই শহরের কোথাও

সভ্যতা নিয়ে একটা বড় আলোচনা হয়েছিল।

কয়েকজন শিক্ষিত মানুষ হাততালি দিয়েছিল,

একজন বৃদ্ধ অধ্যাপক বলেছিলেন,

এই দেশ সহনশীলতার দেশ।

সেদিন রাতেই কয়েকজন মানুষ

ওই বৃদ্ধ অধ্যাপককে রাস্তায় ফেলে পিটিয়েছিল।

কেউ এগিয়ে আসেনি।

পরদিন খবরের কাগজে লেখা হয়েছিল,

ঘটনাটি অত্যন্ত নিন্দনীয়।

তার পরের পাতায় ছিল

ভারতবর্ষের গৌরবময় ইতিহাস।

কুসুম এসব জানত না।

ওর ঘরে কোনো সংবিধান ছিল না,

দেওয়ালে ঝোলানো কোনো মহাপুরুষও না।

ছিল একটা ভাঙা আয়না,

আর তার নিচে শুকিয়ে যাওয়া সস্তা সিঁদুরের দাগ।

কুসুমের বয়স কত ছিল জানি না।

ওকে কখনও জিজ্ঞেসও করিনি।

তবে মনে আছে, ওর ঘরের জানালাটা

কখনও পুরোপুরি খোলা থাকত না।

বাইরে থেকে আলো আসত না।

কাল সকাল দশটায় কুসুমের পেট কাটা হবে।

কুসুমের বুক চিরে দেখা হবে,

ফুসফুস, যকৃৎ, পাকস্থলী

ওদিকে বৃদ্ধ অধ্যাপকটা এখনও হাসপাতালে।

তাঁর ভাঙা চোয়াল দিয়ে

কোনো শব্দ বেরোয় না।

শুনেছি সেদিনও তিনি কিছু বলতে চেয়েছিলেন,

কিন্তু ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ একজন

খুব জোরে চিৎকার করে উঠেছিল,

"মেরে মুখ ভেঙে দে!"

কুসুমকে দুশো টাকাটা আর দেওয়া হয়নি।

আমার চোখের সামনেই ওকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল

বিশু দালাল।

কুসুম সেদিন আর কিছু বলেনি।

শুধু একবার আমার দিকে তাকিয়েছিল।

এখন কবিতাটা শেষ করেই

রাস্তায় গিয়ে শোবো।

একটা বারো চাকার সামনে।

আমার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যাবে

সারা ভারতবর্ষের , সমস্ত সভ্যতার ভার।

এ কোন্ সংস্কৃতি ?

উত্তম দত্ত

বিড়া , উত্তর ২৪ পরগণা । পশ্চিম বঙ্গ , ভারত ।

বেকার জীবন হকার হয়

চলবে কিনা কে জানে !

বদ্ধ ঘরেও দগ্ধ হওয়া

শুটআউটাও আঘাত হানে।

অধ্যাপকের অধ্যাপনায়

খামতি আছে বেশ কিছু

তাইতো দুষ্টু বুড়ো ভাম

নিয়েছে যে তার পিছু ।

সংস্কৃতির ধারক বাহক

বেশ আছে সব রাজ হালে

টালমাটাল হলে পরে সব

পাল খাটায় দেখি অন্য দলে ।

এদের হাতেই ভবিষ্যত

আমাদের সব সন্তানের

শর্ট প্যাণ্টটা ঢাকতে গিয়ে

শর্ট দেখছে শার্টের ঘের ।

বাংলার সব সংস্কৃতির

যারাই ছিল পৃষ্ঠপোষক

হাই ভোল্টেজ তারে এখন

খাচ্ছে দেখি তারাই শক্ ।

বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধিও কি

বন্ধক আছে সিন্দুকে ?

এ সব হল 'আবোল তাবোল'

যা বলে বলুক নিন্দুকে ।

শারদ আবেশ

উত্তরা শতভ্রু প্রাচী

শারদ প্রাতে কাশফুল যে ফুটল বনে বনে,
পড়ল কাঠি ঢাকে, আর উৎসব সারা প্রাণে।

শিউলি ঝরে উঠোন জুড়ে, শিশির-ভেজা ঘাসে,
মা আসছে বছর পরে, বাতাসে খবর ভাসে।

মহালয়ার ভোরবেলা বীরেন্দ্রকৃষ্ণের সুর,
ছোটবেলার সেই আবেশ, আজও বহু দূর।

পুজোর আগে মন মাতিয়ে করা হয় **shopping**,
পুজোর দিনেই মিলে সবাই, করি প্যান্ডেলে **hopping**।

ঢাকের আওয়াজ, শঙ্খ আর বাজলে কাঁসর-ঘণ্টা,
আনন্দ যে বাঁধ মানে না, উচ্ছ্বসিত মনটা।

ঢাকের বোলে, কোমর দোলে, পায়ে লাগে ছন্দ,
নতুন জামার ভাঁজে ভাঁজে লেগে থাকে গন্ধ।

ধুনুচি নাচের পর্ব আর সন্ধ্যারতির কাঁসর,
পাড়ায় পাড়ায় চলতে থাকে শিল্পকলার আসর।

দশমীতে বিদায়বেলায় মন যে ভেঙে যায়,
আসছে বছর আবার হবে-বলো, দুর্গা মাই কি জয়!

একটু জিরিয়ে নিই



পালা–বদল

রঞ্জনা দাশ

আজ রোদ–ভোলানো মেঘলা–মত দিন
ফেলে আসা, পুরনো গন্ধ মাখা দিন
ব্যাস্ত –সমস্ত মাপা কালির ফাঁকে
আজ খুলেছি, হলদে খাতা ধুলোয় মলিন।

ফিকে হয়ে আসা কালির রেখায়
চেনা–আধঁ চেনা কত গল্প লেখা
তার মাঝখানে ক্রমেই খুঁজে পেলাম
কেমন করে আমার বড় হতে শেখা।

প্রথমে আমি ভীষণ ছেলেমানুষ
মেয়েবেলার কত হাজার খেয়াল
আবার কোথাও বয়েসের চেয়ে বড়
লিখছি তখন হিসেবি স্বপ্নের জাল।

তারপরেতে স্বপ্ন ভাঙার পালা
কান্না চাপা অনেক কালো রাত
তখন আমি একটু খানি সহজ
আর ভেতর ভেতর বড়–হওয়ার তাত।

কখন সে তাত হয়েছে চোখের ঝিলিক
আর বেড়েছে চোখের কাজল কালো
ব্যাস্ততা আমি সদ্য শিখছি তখন
মনে হচ্ছে প্রেমে পড়া ভালো।

প্রেমের কথাই উঠলো সেখানটাতে
বুঝতে পারি, কান্না আছে সাথে
তবুও মন ঝড়ের মত দামাল
অচেনা তার হাত রেখেছি হাতে।

অনেক বছর পেরিয়ে সেখান থেকে



তখন আমি ঝিলের মত শান্ত
দমকা হাওয়ায় ঢেউ উঠে না আর
শুধু রোদের ছোঁয়ায় ঝিলিক অবিশ্রান্ত।

এসবের মাঝে কখন, সরেছে ঘড়ির কাঁটা
দিক–ঠিকানায় আমার ইশারা
এলোমেলো এত কথার শেষে
দেখি, নীল আকাশে ফুটেছে সাঁঝ–তারা।

Him

Rwitabrata Chatterje, Barast, India

I have seen my father
Only as a father
Not as the boy
Who was once
Careless, laces untied
Patting the back
Of his long
Lost friend

I have seen my father
Only as a father
Not as a guy
In his youth
Swearing his
Undying love
To someone
He lost somewhere

I have seen my father
Only as a father
Not as the man
Lighting his father's
Face, for one last time
And not as the son
Who held his mother's
Face in his hands
When she wept

Tell me the tale
Of that young male

অজ্ঞাত শরবত



বাহারি চিংড়ি

অমৃতা সাহা

উপকরণ:

খোসা শুদ্ধ বড় চিংড়ি মাছ ৫০০ গ্রাম
একটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ
ছোট একটি আদার টুকরো
কয়েকটি কাচা মরিচ
দুই চামচ টক দই
সামান্য জয়ত্রী
গরম মশলা
হলুদ গুড়ো
কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো
সর্ষে মতো নুন
সর্ষে মতো চিনি
নারকোলের দুধ
৪/৫ টা কাজু বাদাম
১ চামুচ চারমগজ
১ চামুচ জিরে গুড়ো



প্রণালী:

প্রথমে চিংড়ি মাছ গুলো ভালো করে ধুয়ে নুন ও হলুদ দিয়ে কিছুক্ষন মাখিয়ে রেখে দিতে হবে। তারপর পেঁয়াজ লঙ্কা ও আদার একটা পেস্ট বানিয়ে নিতে হবে। কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে ,প্রথমে চিংড়ি গুলোকে হালকা ভেজে নিতে হবে ।তারপর একই তেলে কয়েকটি গোটা গরম মশলা র একটি তেজপাতা অর্ধেক করে ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ লঙ্কা ও আদার পেস্টটা দিতে হবে এবং পেঁয়াজটা বাদামি রং ধরা অবধি ভাজতে হবে।

এরপর একে একে এক চামুচ জিরে গুড়ো ,হলুদ সর্ষেমত নুন ,চিনি,কাশ্মীরি লঙ্কা গুড়ো , জয়ত্রী গুড় এবং সামান্য জল দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে। মশলা থেকে তেল ছেড়ে আসলে দই ভালো করে ফেটিয়ে দিতে হবে। আবারও একটু কষিয়ে বাদাম ও চরমগজ পেস্ট বানিয়ে কড়াইতে দিয়ে নাড়তে হবে বাদামের কাচা গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত। এরপর নরকোলের দুধ দিয়ে দিতে হবে এবার ঝোল ফুটে গেলে চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিতে হবে। শেষে গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন বাহারি চিংড়ি মাছ। ভাত বা পোলাও দিয়ে এই পদটির জুড়ি মেলা ভার ।।

Everything that fits

(A short play)

Diya Deb

Characters:

Grandma (70) -. Came to this country at the age of twenty-two and got married. She never could return to visit her parents. Over the years, she and her husband moved from apartment to apartment before finally creating a home of their own.

Mother (47) - Her daughter. A single mother. Practical, impatient, fiercely protective of her family and short tempered. She has learned to survive by carrying only what is necessary.

Daughter TARA (17) - The third generation. Born and raised here. Restless, funny, curious, dramatic. Old enough to understand that something is ending, but too young to know what it means.

SECURITY OFFICER — At the airport. Mostly indifferent to the enormity of what the family is leaving behind and focused on doing his job efficiently.

SCENE:

A modest living room. Cluttered and cramped. An overfilled old plastic suitcase in the centre of the stage. Clothes photographs, books, kitchen utensils and documents scattered across the floor around it.

Starts with the clock ticking.

The loud music of Taylor Swift playing…

MOTHER enters, carrying a folder of documents.

MOTHER

Tara!

No response.

MOTHER: TARA !!!! (louder voice)

No response..

(stomps in and switches off the music) - Hurry up Tara . We are getting late.

TARA *(offstage)* Mamaa! (annoyed)

TARA enters, switches the music back on.

TARA: We still have half an hour.

MOTHER: Exactly (rolling her eyes)

GRANDMOTHER: enters carrying a small collection of spices. She drops one. It clatters onto the floor.

GRANDMOTHER *(muttering):* Pack these.

MOTHER: What?(over the loud music).

GRANDMOTHER: Give me a small bag

MOTHER: What? (loud)

GRANDMOTHER: A small…

MOTHER: What...Mother?...I can't hear you!
TARA reluctantly switches off the music
MOTHER : (*looks at the spices with a shocked expression, and then distracted , counting the passports*) - Ma surely we can't take all these. We will never be allowed at the security and we have luggage limits.

GRANDMOTHER: Why not? (*She lifts a small jar*) Don't you remember how your father liked this one in his stew? Do we leave this smell behind? He would always say it was the smell of home.

TARA: (*comes forward and sniffs, makes a face*)Oh my goodness… it's the smell of my eyes burning.
(*after a pause*) and I also think it will be too spicy.

MOTHER: *(snatches away the spices and places them beside the suitcase with a bang and the spice spills over a bit on one of the documents).*
Oh no..Oh no…(She wipes it frantically) Now look at this. Such a mess. Ma please just carry the essentials. This is craziness. We can't have spice stained documents. Please..

GRANDMOTHER: It deserves to come with us and it will.

MOTHER : No it absolutely doesn't.

GRANDMOTHER: But you used to love it as a child. Didn't you?

MOTHER: Now I don't.

GRANDMOTHER You used to.
GRANDMOTHER turns and walks away angry and upset. MOTHER watches her go and then picks up a framed photograph. It is a photograph of herself, young and radiant, dancing with a man in a suit.
She smiles despite herself.
She puts it carefully into the suitcase.
TARA enters and immediately takes it out and looks at the photograph.
TARA: (*frowns and smiles***)** Mom you look so pretty … was this really you … and dad? How come I have never seen you dance like this ever?
MOTHER: (sighs)Well we also did not end up loving each other like this (rubs her tired eyes). Huh… now stop distracting me and go along…

TARA: I don't understand (shaking her head). Then why are you carrying it with you? He is gone. We don't even know if he is alive or dead.

MOTHER takes the photograph from her and puts it back in the suitcase.

MOTHER: Because I said so. Now pack fast … Get my laptop charger. Quick..
TARA rolls her eyes and leaves muttering under her breath.
GRANDMOTHER returns carrying an enormous red flowing wedding dress. She tries tucking it in as the Mother looks away and takes out the photo frame.

MOTHER: No No. Ma. No… I have already told you. This weighs 2 kgs. Why do we need to carry this? No one is getting married.

GRANDMOTHER : Who knows, I might (cheekily smiles) .(*pauses*) It's pure silk. Very expensive these days.

MOTHER: Ma

GRANDMOTHER (*waves the photo frame)* : neither are you… why are you carrying this piece of shit?

MOTHER: Are you serious ? You want to take a forty year old wedding garment with you?

GRANDMOTHER: *(She looks at the pile of silk).* This is what I wore. I was twenty-two.
She touches the fabric.
GRANDMOTHER: I came here with only this and a .. a very small suitcase.

MOTHER: I know. I know(*impatiently*)

GRANDMOTHER: *(snapped)* No you don't.

Silence.

GRANDMOTHER:I didn't know anyone. I didn't know the city, I didn't know the language. I didn't know if I loved your father.

MOTHER : But you married him.
GRANDMOTHER: Yes I did. Rather he married me.
A small smile.
GRANDMOTHER: Must say it was a very efficient arrangement.
MOTHER laughs despite herself.
GRANDMOTHER: We got married. I got my citizenship papers. And then somehow—
She looks around the room.
GRANDMOTHER:—there was a life.
Mother's voice softens.

MOTHER: We can't take this along Ma. Let's keep it here. Carry the memories with you.

GRANDMOTHER: *(in a low voice)* But they are fading.

TARA: (walks in with a headphone) : Why are we taking things from a place we are leaving, That's so unhinged. *(Gets a ukulele from the corne*r).. But I need to take this. I can't surely leave this behind.

GRANDMOTHER: What's wrong with you…now you want to take a Ukulele and I can't even take these spices along?
TARA: Priorities Granny. Priorities (and chuckles). I am learning this instrument. I can't surely leave this behind. What if I don't get the same make there.

MOTHER: Keep it back TARA. We have no clue what we are going to get there. So just leave it behind.

TARA: (makes a face) but keeps it beside the suitcase. After so much practice and so many applications I finally got admission in the music school here and now I don't even know… (and trails off) .
Tara's phone rings. She answers on one ring.
TARA: Hello?
Gets up and walks away from them to the corner of the room.
TARA (anxiously) **:** Love—
GRANDMOTHER looks at MOTHER.
TARA: You know I love you, right?
MOTHER raises an eyebrow.
TARA: No, I do. I have always loved you … for the last few months. (Pause) We were never in a situation-ship ever.
GRANDMOTHER covers a smile.
TARA: You are such an idiot.
She listens.
TARA: What?
She looks at the suitcase.
TARA: Of course I'm taking the artwork.
She smiles.
TARA: Yes yes ..the one you made for me.
She listens.
TARA: We'll call.
Another pause.
TARA: There is WhatsApp. There is Snapchat. There is—
She stops.
TARA: I know.
Quietly.
TARA: I know.
She hangs up.
Silence.
MOTHER looks at her watch.
MOTHER: Mom, Tara we have 10 mins more … Please hurry up. We will miss the flight. I hope you know the weight limit of our check in luggage. (*drags her laptop bag and a few files and tries to tuck in the files into her laptop bag ... fails and then tries the suitcase once again.)*
TARA picks up a large framed digital painting
TARA: Mum.
MOTHER: What now?
TARA: This has to come with us… please
MOTHER: What is it?
TARA: Farukh's painting.
MOTHER: (looks at it sceptically) A painting? It's made on a computer, sweetheart. It's not really a painting if i can say so .I have an idea. Take a photograph of it.
TARA: What?
MOTHER: Take a photograph of it. With your phone.
TARA: It's not the same.

MOTHER: You can save it on the cloud or whatever.
TARA:I don't want it like that. I would like to have it with me. Probably my last memory with Farukh…
MOTHER: Tara—(angrily)
TARA*: (shrieks)* but this is so unfair
TARA:(voice cracking and in tears) Grandma gets to take letters from a dead man and I can't take a painting from someone I love?
MOTHER: Enough. Not a word anymore.
TARA: Why?
MOTHER: Because I am saying so…
TARA: It's always enough with you.
MOTHER: You don't know what you're talking about.
TARA (raising her voice**) :**Neither do you!
Silence.
MOTHER: I won't allow you to speak about your grandfather like that.
Silence

GRANDMOTHER *:(slowly)*You know what nobody tells you about leaving?
When I came here, I thought leaving meant getting on a flight.
I was twenty-two.
Little did know I was leaving the smell of my mother's kitchen. The sound of my father's slippers. The crack in the wall beside my bed. The sound of the woman sweeping the courtyard.
You think you're leaving a country.
You're not.
You're leaving thousands of tiny things nobody else will even know you lost.
We moved so many times. So many apartments. So many things we left behind because there was no room to carry them. Every time, we left something behind. A chair. A table. A curtain.
(She looks around the room.)
And then we found this place.
(She looks at her daughter tenderly.)
A few months before you were born.
You know… there were so many cockroaches.
(She chuckles through her tears. TARA grimaces.)
Big ones. Very confident ones too.
Your father used to chase them with a slipper while I screamed from the kitchen
She laughs.
I told him they had been living here longer than we had, so technically we were the intruders in their lives.
(A pause. She touches the wall gently.)
It wasn't much.
But you were born here.
And somehow… that made it home.
(She looks at the suitcase.)
I remember thinking, the first night you slept here—
"We're not moving again."
(Silence.)
I didn't know then how much I would come to love these walls.
Or how hard it would be to leave them.

(Black out)
The clock ticks.
MOTHER looks at her watch.
MOTHER
We really have to go.
She begins closing the suitcase.
GRANDMOTHER: Pack the family photo album.
MOTHER: Check the passports and certificates.
TARA:Where's my charger?"
MOTHER and GRANDMOTHER laugh
TARA (quietly says) : My whole life is on that phone.
(Black out)
SCENE TWO
Airport security.
Three trays sit on a conveyor belt.
The three women stand in line.
They are tired.
They have been traveling for hours.
They do not look back.
A SECURITY OFFICER gestures to the trays.
SECURITY OFFICER: Laptops out. Liquids out. Jackets off.
They start emptying their pockets.
SECURITY OFFICER: Phone, keys, coins. Everything in the tray, please.
SECURITY OFFICER: Any liquids?
TARA: Does lip balm count?
SECURITY OFFICER: Yes.
TARA That's aggressive.
The SECURITY OFFICER doesn't react. GRANDMOTHER empties her pockets.
She takes out a small **house key** and keeps it on the tray and then picks up and throws away in the bin
MOTHER: You still had that?
GRANDMOTHER: Of course. We don't need it anymore.
MOTHER: I know.
TARA: We're never coming back, are we?
Mother : Not now for sure.
TARA: That's not what I asked.
Silence.
Mother: I guess **….**No.
TARA looks at her.
TARA: *So what are we?*
(A pause.)
Migrants? Refugees?
MOTHER:*Does it matter?*
TARA:*I think it does…*
GRANDMOTHER: *Maybe or maybe not.*
Some people leave maybe because they want something different.

Some leave because they need something different.
And some … some…. because staying is no longer possible.

MOTHER: *And some don't leave at all. They just spend the rest of their lives wishing they did.*
TARA*: So which ones are we?*
Mother looks at her.
Mother : *We're people who left home.*
(She takes Tara's hand.)
Let everyone else decide what to call us.
The SECURITY OFFICER gestures impatiently.
SECURITY OFFICER: Madam. Please.
Mother: Yes. Let's go. We are holding up international security with our family baggage.
(A small smile.)
TARA: *"When we arrive... will that place become our home?"*
GRANDMOTHER*(smiles): Probably not*

(A pause.)
But one day, someone will call it home because we arrived."
They walk forward.
BLACKOUT.
END

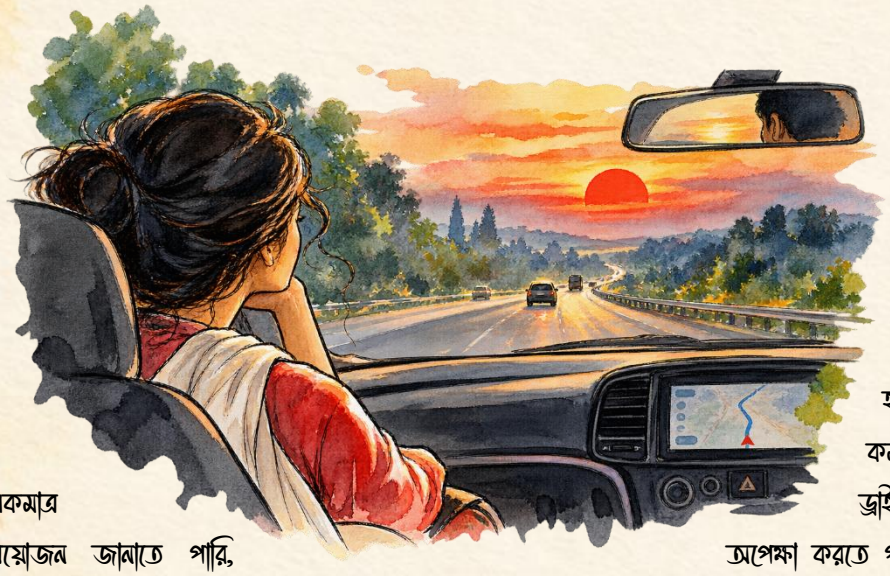
বড় দীর্ঘ যখন পথ....

কথাকলি ভট্টাচার্য্য

পায়ের তলায় রাস্তা ছুটে চলে। গাড়ির জানলার কাঁচের বাইরে সরে সরে যায় রাস্তার দু'ধারের গাছপালা, ঘর বাড়ি বা দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ।

আমি স্টিয়ারিং – এ বসিনি আজও। আমি দেখছি ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে। আমার চোখের সামনে লাল সূর্যটা স্থির। না, ঠিক স্থির নয়, রাস্তার বাঁক অনুযায়ী কখনো ডান দিকে তো কখনো বাঁ দিকে চলে যায়। কিন্তু আমিতো জানি সূর্য স্থির। ঠিক যেন এক আদি, অচলের প্রতি বিশ্বাস রেখে রাস্তার বাঁক মেনে নেওয়া।

আজকাল আকাশ আর নীল দেখায় না কখনও। ভোরে কুয়াশা, দুপুরে ধোঁয়াশা, সন্ধ্যায় অন্ধকার। আমাদের সকলের ছেলেবেলার আকাশ নীল হয়। রাস্তার দু'ধারের গাছের রঙ সবুজ থাকে। তারপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের চারপাশের ধূসরতা বেড়ে যায়। রঙ ঢাকা পড়ে যায় ধুলোয়। আমি গাড়ির জানলার বাইরে এক অবিচ্ছেদ্য ধূসরতা দেখতে পাই শুধু। তবুও মাঝে মাঝে সেই ধোঁয়ার চাদর ছিঁড়ে লাল সূর্যের আলো চোখে এসে পড়ে, ঠিক যেন গভীর রাতে কালো সমুদ্রের বুকে জেগে থাকা লাইট হাউসের আলো।



ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে আমার দায়িত্ব শুধু নেভিগেশন করা। গাড়ির স্পিড আমার হাতে নেই। সামনের গাড়িকে ওভারটেক করা বা পিছনের গাড়িকে রাস্তা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আমার হাতে নেই। এমনকি স্পিড বাড়ানো বা কমানো বা থেমে যাওয়ার সিদ্ধান্তও একমাত্র ড্রাইভারের। আমি শুধু আমার প্রয়োজন জানাতে পারি, অপেক্ষা করতে পারি চাহিদা মেটার, আর গন্তব্যে পৌঁছানোর ঠিক দিক বাতলাতে পারি – তাও আবার গুগল ম্যাপের ভরসায়। সবমিলিয়ে আসলে আমি আদ্যন্ত দর্শক ছাড়া আর কিছু নই।

কি দেখছি আমি! – শুধু দিন আর রাতের ফারাক, আলো আর অন্ধকারের ফারাক! ক্রমাগত কোনো নির্দিষ্ট গতিতে ছুটতে থাকা গাড়ির সামনের সিটে বসলে কিছু সময় পর দিক, সময়, চারপাশের বৈচিত্র, সবকিছু মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় এক অনন্ত ধূসরতায়।
রাস্তা উঁচু নিচু হয়, গাড়ি কখনো থামে, কখনো দ্রুত হয়, ঝাঁকুনি লাগে, কখনো গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়াই, তারপর আবার চলা। এক ধারাবাহিক বহমানতা। অন্তিম গন্তব্য জানা থাকলেও নিকট বা বর্তমান গন্তব্যের কোনো ধারনা নেই। তাই তাড়া নেই, কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোথাও পৌঁছাতে পারা বা না পারার কোনো দুশ্চিন্তা নেই।

এ এক অদ্ভুত জীবন দর্শন – যদিও আমি কোনো দার্শনিক নই, তবুও –

আমাদের জীবন যেন এরকমই এক বহমান আবেশ মাত্র। আমরা অন্তিম গন্তব্য জানি এবং আমরা কেউই আমাদের গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে নেই। আমাদের হাতে গুগল ম্যাপ আছে। আমাদের ম্যাপ পড়তে শিখতে হবে এবং আমরা সবাই কোনো না কোনো ভাবে শিখে যাইও। তবে যত তাড়াতাড়ি ম্যাপ পড়তে শিখবো তত আমাদের রাস্তা হারানোর সম্ভাবনা কমবে।
আমরা ওই এক অচল অনাদি তে মন:সংযোগ করলেই বুঝতে পারবো বাকি সবকিছু আবছা, মিথ্যার ধোঁয়ায় ঢাকা। যে মিথ্যার রঙ রূপ আমার গাড়ির জানলার কাঁচের রঙ, গাড়ির ভিতরের পরিবেশ এবং গাড়ির সাস্পেন্সরের ওপর নির্ভর করে।

যখন বহমানতার আবেশে স্থান কাল এর হিসাব মুছে যা, আমরা অতীত ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি না, তখন আমরা বর্তমানকে উপভোগ করি নির্বিচারে।সেটাই পথ চলার আনন্দ। বর্তমান মুহূর্ত তো ক্ষনিকের। তা সে যতই মনোগ্রাহী হোক না কেন, সে পিছনে সরে যায়। আর আমাদের এগিয়ে যেতে হয় রাস্তার শেষে ঘরের উদ্দেশ্যে।

চলার পথে অনেক ইচ্ছে, সাধ, আহ্লাদ জলাঞ্জলি দিতে হয়, বয়েস নির্বিশেষে সবাইকে। আবার হঠাৎই রাস্তার কোনো মোড়ে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো সুখ পাওয়া যায়। আমরা সকলেই নিজেদের ঠিক সাজিয়ে গুছিয়ে নিই পথ চলার চাহিদা অনুসারে।
আর রাস্তার শেষে ঘরে পৌঁছে এই দীর্ঘ যাত্রাটাকে একটা রাতের স্বপ্নের মত ছোট্ট মনে হয়। আমরা ভুলেও যাই সব অভিজ্ঞতার কথা, আমাদের সমস্ত অনুভূতির কথা।

শুধু মনে থেকে যায় একটা ছবি – ধূসর প্রেক্ষাপটে আঁকা পায়ের নিচে দ্রুত সরে যাওয়া রাস্তা আর চোখের সামনে স্থির লাল সূর্য।।

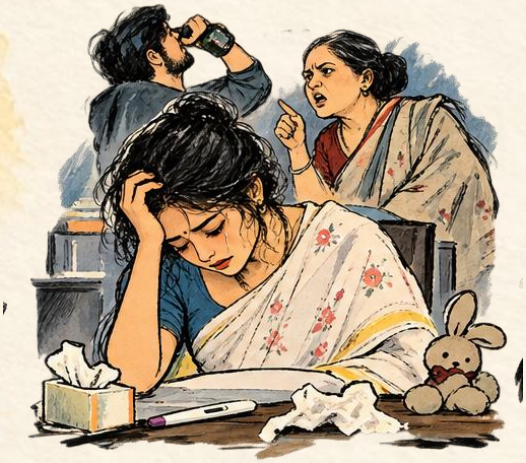
ফুটনোট

ঈশিকা কুন্ডু, বার্লিন

(১)

"ও এখন কার সাথে আছে ?" "এতো রাত অবধি অনলাইন কেনো ?" "এতক্ষণ ধরে ফোন বিজি কেনো ?" এই ভিড় করে আসা চিন্তাগুলো অষ্টাদশী কে তাড়িয়ে তাড়িয়ে খেত !





(২)

তিনবার মিসক্যারেজ বরিশ– এর ! শেষবারের পর একেবারে ভেঙেচুরে গিয়েছিলো সে..বরের মদ খাওয়া আর শাশুড়ীর মুখঝামটাও বেড়ে গিয়েছিলো একই সাথে..

(৩)

বাইশ গান গায়, গিটার বাজিয়ে...অবশ্য প্রেমিকা লাস্ট ওয়ার্নিং দিয়েছিলো , "এবছরও তুমি চাকরি না পেলে , বাবা আর কোনো কথা শুনবে না.."





(৪)

ওদের থার্ড অ্যানিভার্সারি ছিলো সেদিন..বয়ফ্রেন্ড একটা ফুলের তোড়া আর একটা চিঠি ধরিয়ে দিয়েছিলো অষ্টাদশীর হাতে , তাতে লেখা ছিলো..

তুই প্রিয়–ই আছিস ,থাকবিও.. ঘটা করে আর লিখলাম না,
আসলে ভালোবাসা টা সমুদ্রের ফেনার মতো..যত মুঠোবন্দী করতে চাইবি ,
তত উবে যাবে..

(৫)

গতমাসে বত্রিশ শ্বশুরবাড়ি ছেড়েছে , আজ পনেরই জুন, গতবছর আজকের দিনেই ওর শেষ আশাসম্বলইচ্ছে বাথরুমে লুটোপুটি খাচ্ছিলো..আজ ওর এনজিও'র ওপেনিং ! আজ থেকে ছ–জন বাচ্চা ওকে 'মা' বলে ডাকবে...





(৬)

প্রেমিকার বিয়ে হয়েছে , দুবছর হলো..বাইশ গানটাই গাইছে..নিজের সুর দেওয়া গান সমেত দাপিয়ে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর এ–মাথা , ও–মাথা ! আজ নন্দনে শো...বাইশ গাইছে, শো শেষে বেরোনোর সময় হঠাৎ সেই মুখ যে মুখের জন্য বাইশ একটা সময় মরতো–বাঁচত,
"শেষ গানটা আমার জন্য লিখেছিলে ?"
–– না
–– তাহলে ?
– আপনাকে ভুলে যাওয়ার জন্য লিখেছিলাম..

ঘরে ফেরার গান

অনুপ্রিয়া চক্রবর্তী

আজ মহাষষ্ঠী। সকালে ঘুম ভাঙল শঙ্খধ্বনির শুভ সূচনায়। প্রথমেই বিগত ৪ বছরের অভ্যেস অনুসারে বোঝার চেষ্টা করলাম আমি এই মুহূর্তে কোথায় আছি। বেশ কয়েক বছর প্রথম বার নিজেকে বোঝাতে হলোনা যে আমি অনেকদিন হলো বাড়ি ছাড়া হয়েছি, গত বছরের মতন আজকের দিনে আমাকে নিরাশার সম্মুখে স্বাভাবিক আচরণ করে কাজে বসতে হবেনা।

আজ আমি বাড়িতে। এত বছর দেশ–বিদেশের বিভিন্ন কোনা থেকে যেই মন খারাপ নিয়ে কলকাতার বন্ধুদের পুজো পরিক্রমার ছবি **social media** তে দেখতে হতো, এ বছরের মতো অন্তত সেটা ভোলা থাকবে। আমার বাড়িতে আজকে সেই অনুভূতিটার কোনো জায়গা নেই। আমার কলকাতা আজকে উৎসবে মেতে উঠেছে। এবং আজকে আমি ঘরে ফিরেছি। আজ আমি ঠিক তার মাঝে।



সময়ের সাথে রূপ পাল্টেছে দুর্গাপূজাও। সর্বজনীন দুর্গা পুজো আজ কলকাতার বাইরে দেশ–বিদেশ ছড়িয়ে গেছে। দুর্গোৎসবের উন্মত্ত হাওয়া বয়েছে জগতের কোনায় কোনায়। সেই উন্মাদনায় ভেসেছি আমরা বছরের পর বছর। কিন্তু মনের মধ্যে কোথাও একটা কোনো চাওয়া অসম্পূর্ণ থেকে যেত। দূরে থাকতে গিয়ে অনেক বার কিছু ইচ্ছে বা আবেগকে শীতল করতে হয়েছে। তবে আজকে সেটা হবেনা। ভালোবাসার মানুষ গুলো আজ আমার কাছেই আছে। ওইতো পাশের ঘরে মা–বাবা চা খাচ্ছে। আজ ফোন– এর চার কোনার মধ্যে তাদের অস্তিত্ব সীমিত না। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা একসাথে পূজার আনন্দে মাতব। সেই ক্ষণিকের ভালো লাগা আঁকড়ে কাটবে আগামী গোটা বছরটা।

এ কদিনে চেনা আবহেও দেখা দিয়েছে অনেক অচেনা পরিবর্তন। কেন জানিনা মনে হচ্ছে আমার খুব চেনা শহরে আজ আমি অচেনা। প্রতি বাড়ির গন্ধ এক – আমার প্রজন্মের ছেলে–মেয়েরা কেউ ই আর বাড়িতে নেই। চেনা মানুষ গুলো আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে। পুজোর সময় মা–এর সাথে সাথে কেউ কেউ নিজের বাড়ি ফিরছে। সে ক্ষেত্রে আজকের দুর্গা পুজোর একটা **metaphorical significance** তৈরী হয়েছে। কাজের দৈনন্দিন টানাপোড়েনে আটকে অনেকে আবার ফিরতেও পারছেনা। দুর্গা পুজোর সূত্রে এই নতুন জগতে আমার চেনা মুহূর্ত গুলোকে খুঁজতে গিয়ে বুঝলাম – কলকাতা আছে কলকাতাতেই, কিন্তু "ফিরবো বললেই ফেরা যায়না" ।

"শৈশবে আর ফেরা যাবেনা তো, হারিয়ে গেছে সে দেশ" ।কিন্তু নতুন জগতে নতুন ভাবে আনন্দ করতে শেখাই যায়।

চিরকুটে চিরকুটে কার্টুনিজম

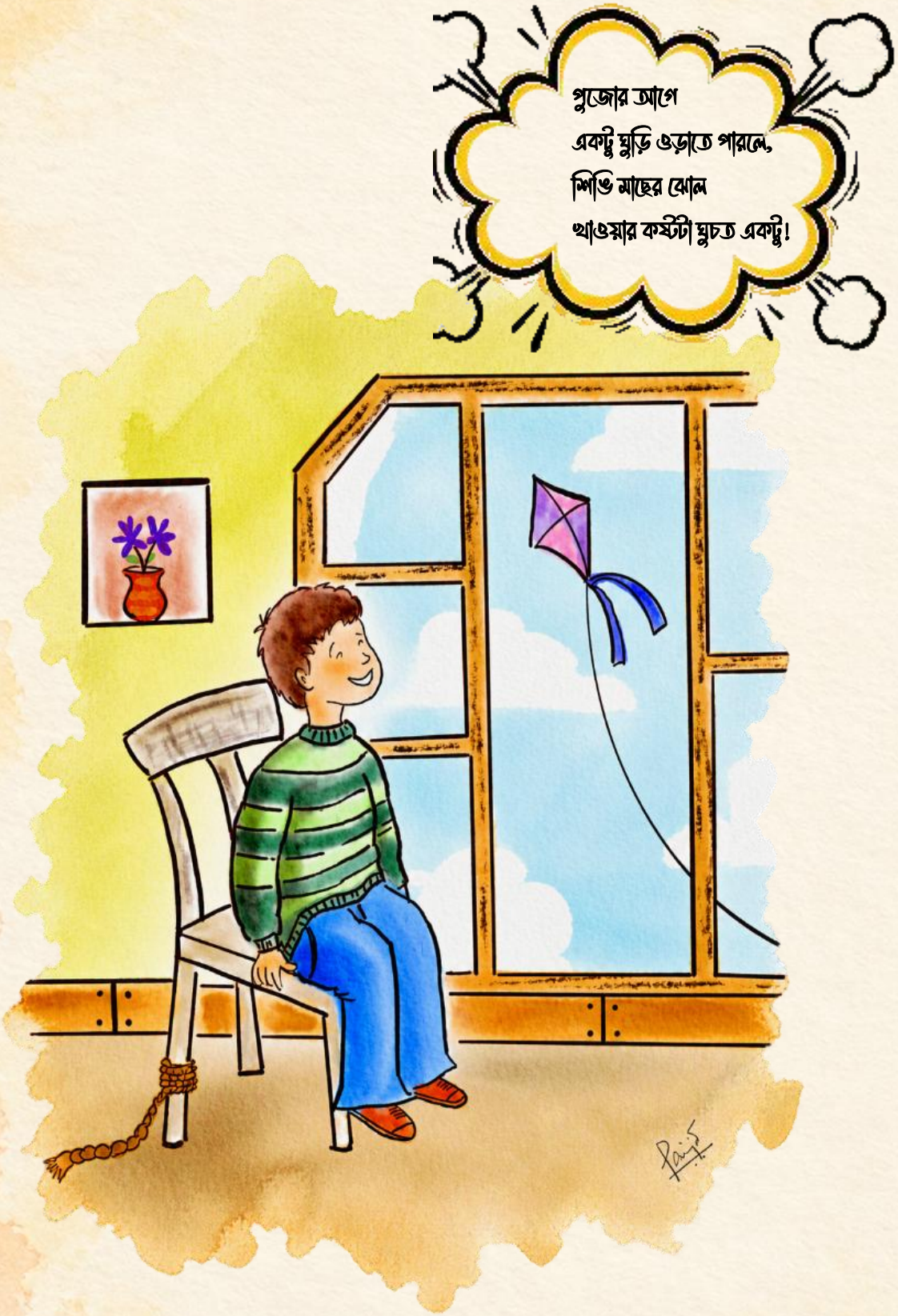


পুটুভুকু

চরিত্রায়ণ এবং অঙ্কনে: পারিজাত মুখার্জি

শব্দে: দীপাঞ্জন দাস




পুজোর আগে
একটু ঘুড়ি ওড়াতে পারলে,
শিভি মাছের ঝোল
খাওয়ার কষ্টটা ঘুচত একটু!


ছেড়ে দাও মা, কেঁদে বাঁচি, হামার বাম দিয়ে আছি।
বোলতা কো হিন্দি মে কয়া বোলতা হ্যায়???


কিরে টুনু, আমি এত নৌকা বানাচ্ছি, তোর মজা হচ্ছে না?
মজা তো হচ্ছে, কিন্তু আমার গায়ে যেন জলের ফোঁটাও না লাগে!


কি যেন ভাবছিলাম????
ওহ্হ হ্যাঁ, পিথাগোরাস থিওরেম!
ধ্যাত্তেরিকা, সব গুলিয়ে গেল,
একটা ঘুড়িও খুঁজে পাই না!


ঘুড়িইইইইইইইইইইইইইইইই!
ঘুড়িইইইইইইইইইইইইইইইই!
ভৌ ভৌ!


কৌ কৌ!!
ভৌ ভৌ!! ভৌকুকু!


একটা বন্ধু থাকলে সারাদিন কাগজের নৌকা ভাসাতাম।
থিক থিক!!!! ওই জন্যেই কোনো বন্ধু নেই!


গাছে আটকে গেল রে কুকু,
তুই কি ভৌ ভৌ ছাড়া আর কিছু বলতে পারবি?
ভৌউউউউ
ভৌউউউউ!


সিন একদল জমজমাট, পুচিকে দেখতে পেয়ে ভুল্লু সাহায্যের জন্য ডেকেছে।
পুচিও নতুন বন্ধু পাতাবে বলে দৌড়ে চলে এসেছে!!!!
ওই মরচ্ছি ছেলেরা পুচিকে ভাগিয়ে দিয়েছে, মিমিদের চেহারা নিয়ে মুড়ি ওড়াবি, তুই তো নিজেই উড়ে যাবি রে বুদ্ধুরাম।


ঘুম ঘুম এই চোখে.....
এই হাঁদারাম কুকুরটার মাথায় বুদ্ধি নেই নাকি?
যাকগে বাবা, আমি ঘুড়ির দড়িটা চিবাই!

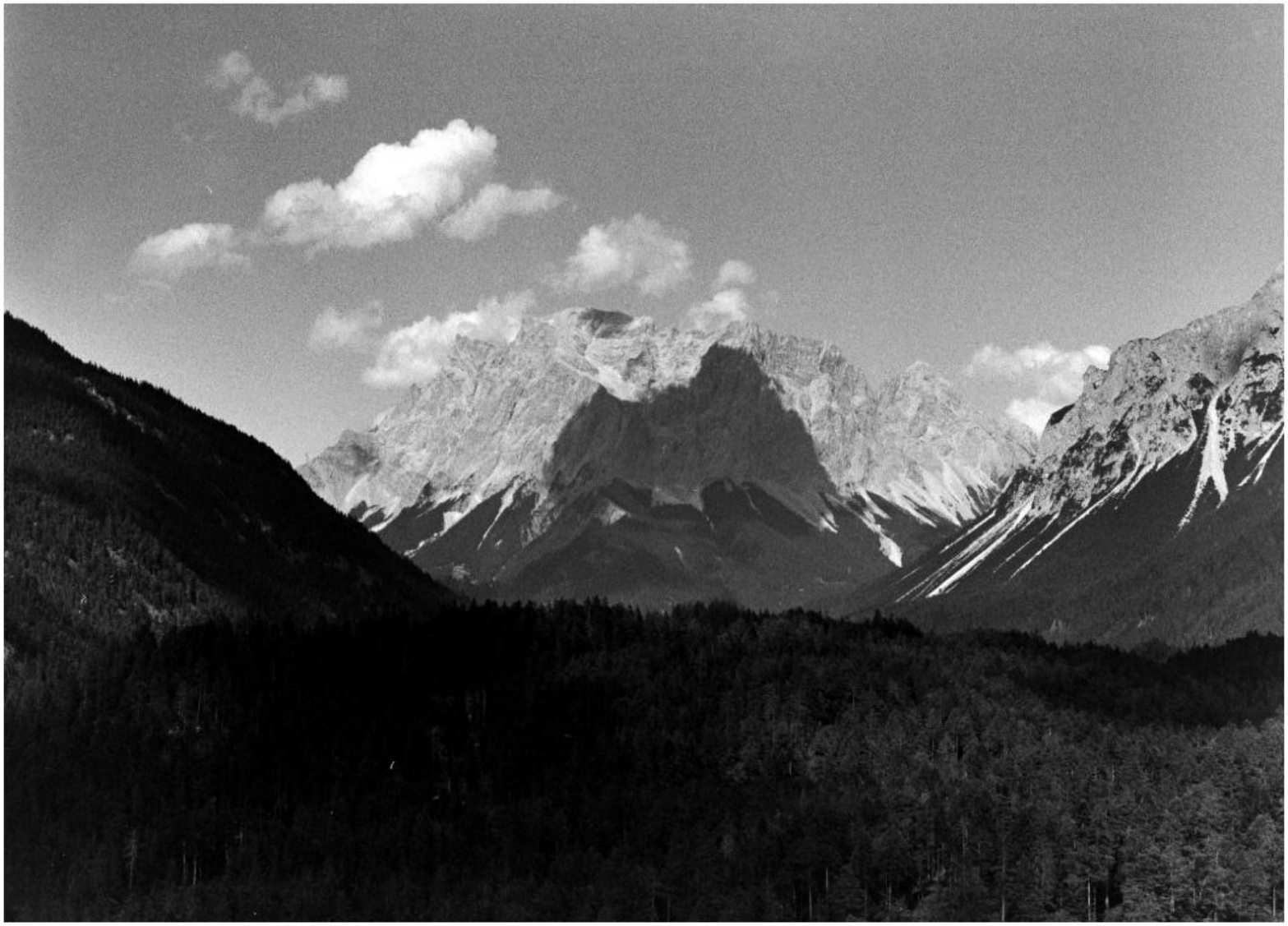

দুর্গা পুজো

অবাক ভিউ-ফাইন্ডার









LEFT: NETZE, LEINEN UND KANISTER ERZAHLEN VOM ALLTAG AUF DEM WASSER. JETZT LIEGT DAS BOOT STILL, UMGEBEN VON DEN SPIEGELUNGEN DER WOLKEN.
KOSMO FOTO MONO 100 | ENTWICKELT IN 510 PYRO

RIGHT: DAS LICHT ZEICHNET DIE ARCHITEKTUR AUS DER DUNKELHEIT. FENSTER, DIAGONALEN UND DIE STRUKTUR DES BETONS GEBEN DEM RAUM KONTUR, WAHREND VIELES IM SCHATTEN VERBORGEN BLEIBT.
ILFORD PAN F PLUS | ENTWICKELT IN 510 PYRO

BOTTOM: HELLE FELSWANDE UBER DUNKLEN WALDERN, DAZWISCHEN TIEFE SCHATTEN. DER BLICK AUF DIE ZUGSPITZE VOM
ZUGSPITZBLICK IN OSTERREICH – FESTGEHALTEN IN SCHWARZWEIS, MIT DEM SICHTBAREN KORN DES KENTMERE 400.
KENTMERE 400 | ENTWICKELT IN 510 PYRO

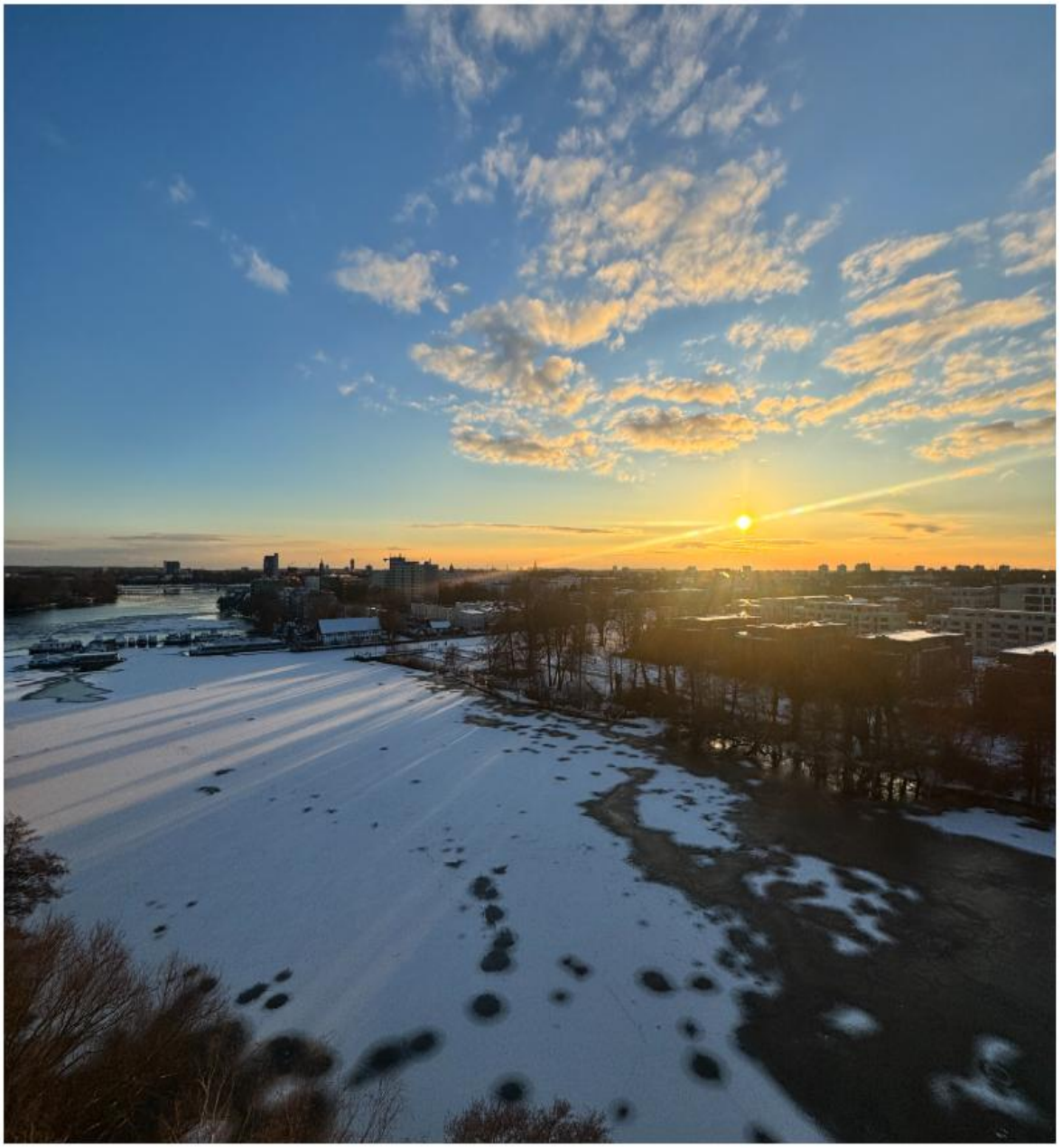
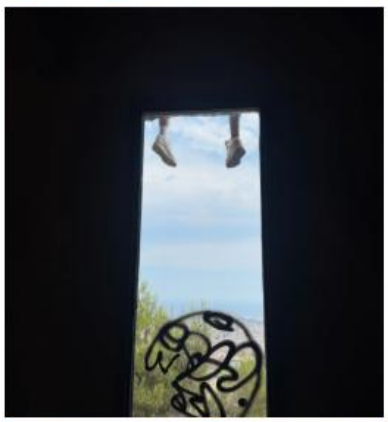
- STEPHAN LEISER, AALEN, DEUTSCHLAND



THE DYNAMICITY OF A LIFE: THROUGH THE FOG, INTO THE LIFE. A VARIETY OF PHOTOGRAPHS CAPTURED BY ARIJIT PATRA FROM BERLIN, GERMANY






THROUGH THE EYES OF A DIRECTOR: HOW LIGHT TRAVELLED THROUGH EMPTINESS, FINDING THE FRAMES IT LOVED, UNTIL WEARY FROM ITS JOURNEY, IT FELL LIKE SILK CURTAINS AT THE END OF A THEATRE'S FINAL ACT.

DIRECTOR: ANIBOROTO SARKAR, BERLIN, GERMANY



IS THE MAKER GOD, OR IS GOD THE MAKER?

PHOTOGRAPHY BY: DIA DEB, BERLIN, GERMANY



HIS HOUSE UPON THE MOUNTAIN. HIS LIVESTOCK BENEATH HIS GAZE.

PHOTOGRAPHER: TANIYA BANERJEE, BERLIN, GERMANY



WHEN YOU WERE WITH ME,
IT FELT LIKE ETERNAL BLISS.
WHEN YOU LEFT,
IT BECAME A NEVER-ENDING HALF-TRUTH.
LEFTOVERS OF A FOREVER THAT NEVER WAS.

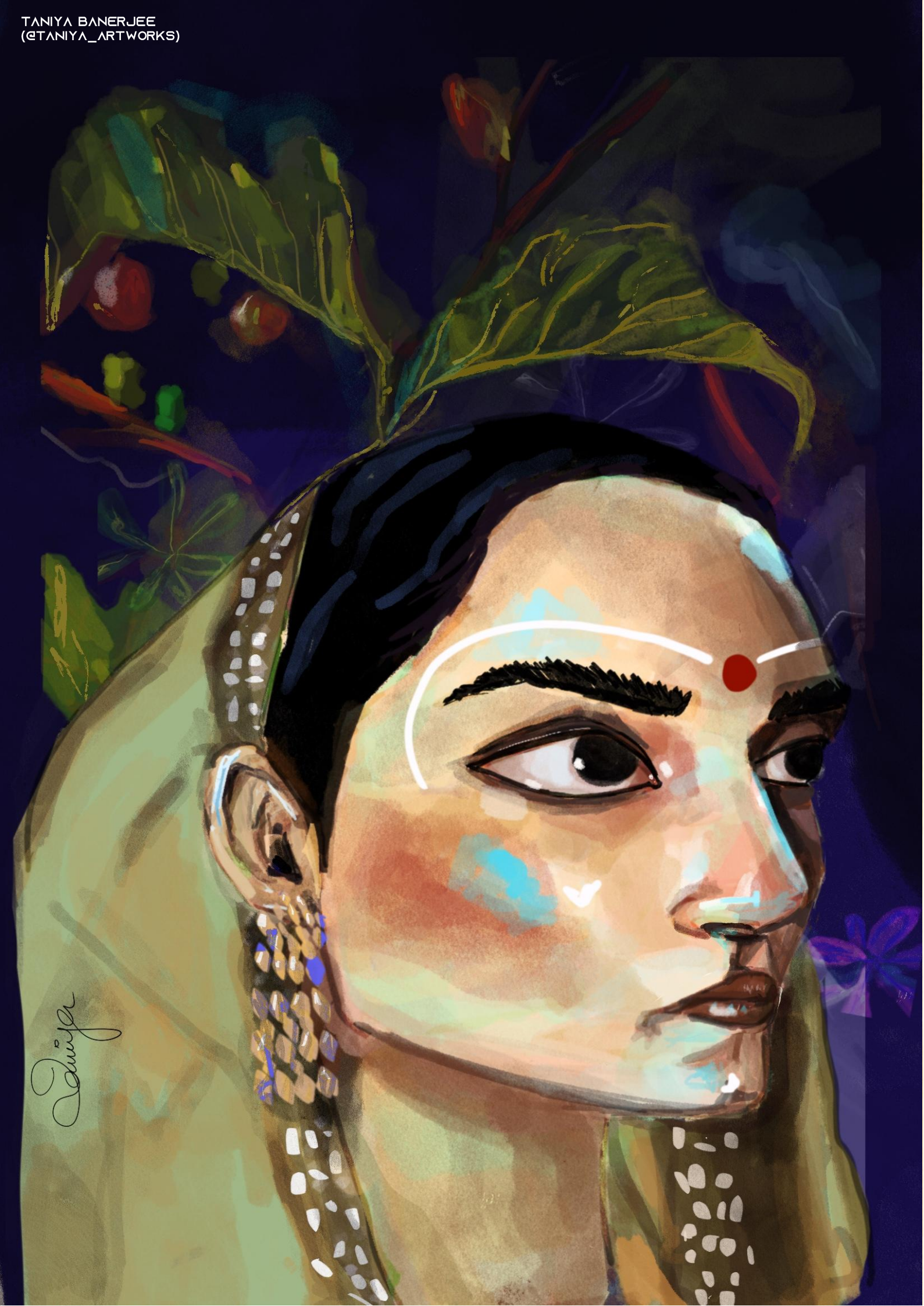
PHOTOGRAPHER: DIPANJAN DAS, BERLIN, GERMANY

রঙে ভেজা ক্যানভাস




ANUPRIYA CHAKRABORTY

TANIYA BANERJEE
(@TANIYA_ARTWORKS)



SHREYA ROY



POULAMI GHOSH



SAIKAT DUTTA




SRIDATRI BHATTACHARYA

POOJA SUR SAHA



PARAMITA CHAKRABORTY





RANJANA DAS

DIYA BHATTACHARYA



ভোর হলো, দোর খোলো,
খুকুমণি ওঠো রে



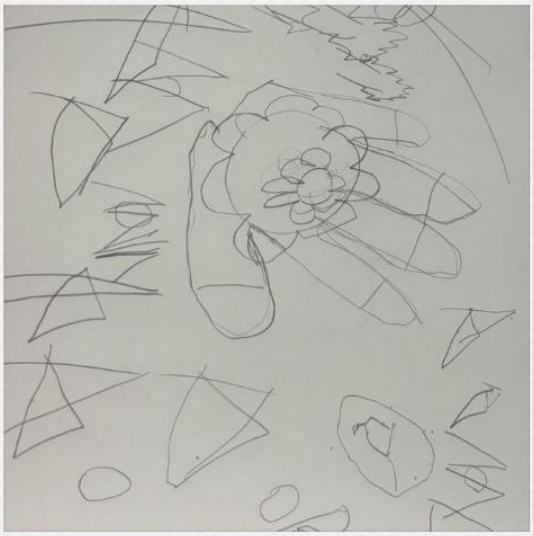
Our future Artists



Urjita Mukherjee
Age - 3y



Ajooni Khullar
Age - 3y



Ajooni Khullar
Age - 3y

Our future Artists



Aarjohee Saha
Age - 11y



Tveesha Mangal
Age - 4y



Tveesha Mangal
Age - 4y



Siddiksha
Bhattacharyya
Age - 2y

Our future Artists



Kiana Panda
Age - 4y



Kiana Panda
Age - 4y



Mayra Barik
Age - 5y

লিখে নিও মন মতো

খোলা পাতা রেখে দিলাম





